'মার্ক্সীয় গ্রন্থমালা—১৬

কৃষক-আন্দোলন

মুজাফ্ফর আহ্মদ
রেবতী বর্ম্মণ
আবদুল হালিম
আবদুল্লা রসুল

ছয় আনা]

বর্ম্মণ পাব্লিশিং হাউস,
৭২, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা।

—প্রকাশক—
ব্রজবিহারি বর্মণ
বর্মণ পাব্‌লিশিং হাউস
৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

—প্রিন্টার—
উমেন্দ্র নাথ কুণ্ডু
হিন্দুস্থান প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট
২৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

ভারতের কৃষকগণ আজ সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। শুধু তাহাই নয় সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলনও পরিচালিত করিতেছে। কৃষকদের সমগ্র ভারতের উপর ভারতীয় কৃষক-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে উহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কেননা, যাহারা জাতীয় শক্তির প্রধান অংশ তাহাদের জাগরণ ও আন্দোলনের দ্বারাই স্বাধীনতার আন্দোলন শক্তিশালী হইবে। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের অর্থ ভারতবর্ষের কৃষকশ্রেণীরই মুক্তিলাভ। প্রকৃত পক্ষে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক কথায় কৃষক-আন্দোলন। কেননা, কৃষি-প্রধান দেশ ভারতবর্ষে কৃষকদের মুক্তি না হইলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে, একথা বলা যায় না। যে দেশের শতকরা ৬৭ জন লোক কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে এবং যে দেশের ধন-দৌলতের "একশত ভাগের ৯০ ভাগ কৃষকেরা পয়দা করেন" সেই দেশে কৃষকের মুক্তি না হইলে কিসের স্বাধীনতা হইল! এখানে একথা বলাই বাহুল্য যে, কৃষকের মুক্তির অর্থ তাহার রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক মুক্তি। জাতির মেরুদণ্ড আজ শোষণের চাপে, দেনার দায়ে ও লাঞ্ছনার তাড়নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ইহার বাঁচিবার পথ বাহির করিতে হইবে। ইহাকে ধ্বংসের পথ হইতে ফিরাইতে হইবে, কৃষক না বাঁচিলে এই জাতি বাঁচিবে না। ইহার বাঁচিবারও একমাত্র পথ ইহার রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক মুক্তি। তাই কৃষকেরা আজ শ্রেণী-সংগঠন করিয়া আন্দোলন চালাইতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। কৃষকদের এই মুক্তি-সংগ্রামের পথে যাহারা সবকিছু দিয়া সাহায্য করিতেছেন এবং যাহারা কৃষকদের মুক্তির সংগ্রামের পথে নিজেদের কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে এক করিয়া

ফেলিয়াছেন সেই কয়েকজন বিশিষ্ট কৃষক ও শ্রমিক নেতাদেরই মুখের ও প্রাণের কথা সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তিকা সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহারা এদেশের কৃষকদের মর্ম্মবেদনার ভাষা দিয়াছেন। তাহাদের "খালি-পেটের" ব্যথা জানাইয়াছেন, কি উপায়ে তাহাদের দুঃখ মোচন হইবে, কোন্ পথে তাহাদের মুক্তি আসিবে তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহারা শহরের আরাম কেদারার রাজনীতিজ্ঞ নন। ইহারা জনগণের নিজেদের লোক। ইহারা জনগণের ভিতরে গিয়াছেন। তাহারা অনুষ্ঠিত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কৃষকদের বিক্ষোভের মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাহাদের দুর্দ্দশার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। উহাদের বক্তৃতাগুলিতে এই সব তথ্যই আছে।

আমাদের দেশে অনেকে এখনও কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনকে প্রগতিশীল আন্দোলনরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। একশ্রেণী অর্থাৎ জমিদার ও ধনিক শ্রেণী, শ্রেণী-সংগ্রামের ভয়ে ভীত হইয়াছেন। মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় ও এই আন্দোলনকে বৈজ্ঞানিক নজরে দেখিতে না পারায় ভীত ও চঞ্চল হইয়াছেন। কিন্তু ইহারা কেহই তলাইয়া দেখিতেছেন না যে, যাহারা জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করে, তাহাদেরই বাঁচিবার দাবী সর্ব্বাগ্রে। এই সংগ্রাম জাতির পক্ষে মোটেই অশুভ নয়, শুভ। এই সংগ্রামের ফলে জাতি উন্নতির পথেই অগ্রসর হইবে। যে দেশে ভূমির উপস্বত্বের উপর বেশীর ভাগ লোককে নির্ভর করিতে হয় সে দেশের ভূমির সমস্যা দূর না হইলে, জাতির মঙ্গল হইতে পারে না। প্রাচীন ভূমি-বণ্টন প্রথার পরিবর্ত্তন না হওয়ার ফলে আজ এদেশের দুর্দ্দশা বাড়িয়া চলিয়াছে। নূতন ধারার ভূমি-বণ্টন-প্রথা তাই অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ফলে যে আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে কায়েমী-স্বার্থে আঘাত পড়িতেছে তাই একদল লোক শ্রেণী-সংগ্রামের ভয়ে চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উপায় নাই—জাতির বাঁচিবার পক্ষে ইহা একেবারেই অনিবার্য্য।

বাংলার কৃষকের সর্ব্বনাশের মূল জমিদারী-প্রথা। "জমিদারগণ ও জমিদারী-প্রথা ইংরেজ আমলের একটা মস্তবড় অভিশাপ।" পূর্ব্বে এদেশে এই জমিদারী-প্রথা ছিল না। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ সালে এক কলমের খোঁচায় কৃষকদের হাত হইতে জমির মালিকী-স্বত্ব কাড়িয়া লইয়া জমিদারী-প্রথা সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রথাই বাংলা দেশের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। "বাংলার মোট ভূমি-রাজস্ব ৩ কোটী ১০ লক্ষের কিছু উপর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন প্রতি একর জমিতে জমিদার রাজস্ব দিয়া থাকে পনের আনা। কিন্তু জমিদার মোট খাজনা আদায় করে ১৫ কোটী টাকার মত, প্রতি একরে ৩৲ টাকা......। বাংলার জমিদারের আয় খাজনা বাদে ১৫ কোটী। আবওয়াব বাবত ২০ কোটী আর খাস জমি বাবদ ১০ কোটী। কমপক্ষে এরা মোট আদায় করে ৪৫ কোটী টাকা। কৃষকের হাতে ফসলের খরচা বাদ দিয়া থাকে ৭০ কোটী টাকা। কি সাংঘাতিক! এর ভিতর হইতে ৪৫ কোটী টাকা জমিদার আত্মসাৎ করে। এখন আমাদের মোটেই বুঝিতে কষ্ট হয় না, কেন আমাদের কৃষক ঋণগ্রস্ত, কেন কৃষকের জমি ক্রমেই অপর হাতে চলিয়া যাইতেছে, কেন গত ৮ বৎসরে ১০০ কোটী টাকার জমি বন্ধক ও বিক্রয় হইয়াছে। আজ কৃষকের ঋণ ২০০ কোটী টাকার উপর; বাকী খাজনা সহ নিশ্চয় এর পরিমাণ আরো বেশী। অথচ কৃষকের হাতে যে জমি আছে তার মোট বাজার-দর আজকালকার দিনে ২০০ কোটী টাকার মতই হইবে। কৃষকের সম্পত্তি আর কৃষকের ঋণ যদি সমান হয়, তবে আমাদের বাংলার কৃষককে দেউলিয়া ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে।" যে জমিদারী-প্রথা হইতে এই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে উহার অবিলম্বে উচ্ছেদ ভিন্ন দেশের মঙ্গল নাই। এখানে আরো একটা কথা বলা আবশ্যক। অনেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারী-প্রথা উঠাইবার পক্ষপাতী। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ দিবে কে? উপরে কৃষকের যে অবস্থার চিত্র দেখা গেল

তাহাতে বাংলার কৃষকের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মত কোন সংস্থান আছে কি? "জমিদারেরা ১৪৬ বছর ধরিয়া কৃষকদের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহার পূরণ কে করিবে তাহা আমরা জানিতে পারি কি?" বাংলা সরকার ফ্লাউড কমিশন নামে একটী ভূমি-রাজস্ব তদন্ত-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই কমিশন যদি ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারী-প্রথা তুলিয়া দিবার সুপারিশ করেনও আর সেই সুপারিশ যদি বৃটীশ পার্লামেণ্ট মানিয়া লয় তাহা হইলেও সেই ক্ষতি পূরণের টাকাটা আমাদের কৃষকদের নিকট হইতেই আদায় করা হইবে না কি? "কাজেই জমিদারী-প্রথা তুলিয়া দেওয়ার জন্য যেমন জোরের সহিত আন্দোলন চালাইতে হইবে, ঠিক তেমনি জোরের সহিত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিরুদ্ধেও আমাদিগকে আন্দোলন চালাইতে হইবে।" বাংলার কৃষকশ্রেণীর পক্ষ হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক-সভা ফ্লাউড কমিশনের নিকট যে মেমোরেণ্ডাম প্রদান করিয়াছেন তাহাতেও বিনা ক্ষতি-পূরণেই জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ দাবী করা হইয়াছে।

এখানে আরো একটা কথা বলা একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষ আজ যে বিপ্লবের সম্মুখীন, তাহার রূপ সম্পূর্ণ ভাবে বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক। অনেকে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মনে করেন, এই সময়ে ভূমির জাতীয় সম্পত্তিভুক্ত করার দাবী ভুল। তাহাদের মতে ভূমি জাতীয়-সম্পত্তিভুক্ত করার দাবীটি সমাজতান্ত্রিক দাবী। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ ফিউদ বা সামন্ত-প্রথার ধ্বংস বুর্জোয়া আন্দোলনের কর্ত্তব্য এবং সামন্ত-প্রথা ধ্বংস করিয়া ভূমি রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিয়া উহাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্পূর্ণ ভাবে বুর্জোয়া-আন্দোলনের কাজ; সুতরাং ভূমি জাতীয় সম্পত্তি-ভুক্ত করার দাবী বুর্জোয়া দাবী; বুর্জোয়া আন্দোলনের দাবী উহা সমাজ-তান্ত্রিক দাবী নয়। জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ করিয়া যাবতীয় ভূসম্পত্তি জাতীয়-সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া উহা রাষ্ট্রের অধীনে স্থাপনের দাবী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই কালোপযোগী দাবী।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনেও আজ কৃষক তার শ্রেণী-স্বার্থের খাতিরেই যোগদান করিতেছে। কৃষক মনে করে, এই বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের ভিতর দিয়া তার জমির ক্ষুধা মিটিবে। সেই হেতু কৃষকশ্রেণীর দাবী লইয়া অগ্রসর হইলে জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হইবে। "জমির জন্য কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রাম যত শক্তিশালী হইবে, পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামও তত সবল হইবে; আবার পূর্ণ-স্বাধীনতার লড়াই সুসম্পন্ন না হইলে জমিদারী-প্রথা ধ্বংস হইবে না বা জুলুমেরও অবসান ঘটিবে না।"

কৃষকদেরও কর্ত্তব্য হইবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করা "কৃষকেরা যদি জোট বাঁধে, এক হয়, সমিতি গড়িয়া তুলিয়া আন্দোলন চালায়, দেশে আরো যাহারা স্বাধীনতাকামী তাহাদের সহিত যোগ দেয় এবং স্বাধীনতা ও অন্যান্য দাবীগুলি সামনে রাখিয়া বিরুদ্ধ শক্তিগুলির সঙ্গে লড়িতে পারে, তবেই তাহাদের সমস্যার নিষ্পত্তি হইবে।"

কৃষক আজ জমির ক্ষুধায় কাতর। জাতিকে ও জাতীয় আন্দোলনকে তার এই ক্ষুধা মিটাইতে হইবে।

এই সংগ্রহটি কৃষকশ্রেণীর এই ক্ষুধার তাড়নার কথা আর কি কি উপায়ে তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে তাহারই বিবরণে ভরা। এই পুস্তিকাটিতে বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। কৃষক আন্দোলনের পক্ষে এই প্রকার সংগ্রহের প্রয়োজন অনেক খানি।

জুলাই,
১৯৩৯

ধরণী গোস্বামী

—সূচী—

মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ

—ফরিদপুর—

কৃষক আন্দোলন

[এক]

কৃষক বন্ধুগণ,

আপনারা আমাকে আপনাদের জিলার এই প্রথম কৃষক সম্মেলনে সভাপতির কাজ করিবার জন্য ডাকিয়া আনিয়াছেন। আমাকে এখানে ডাকিয়া আনিয়া আমার উপরে যে স্নেহ ও ভালবাসা আপনারা দেখাইলেন তার জন্য আমি, আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। কৃষকদের জন্য যতটুকু কাজ আমি করিতে পারিতেছি এবং তার জন্য যতটুকু সম্মান আমার পাওয়ার অধিকার আছে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী সম্মান বাংলার কৃষকেরা আমার উপরে দেখাইতেছেন। কৃষকদের দেওয়ার হাত খুব বেশী। তাই, তাঁহারা সব বিষয়েই খুব বেশী বেশী দিয়া থাকেন।

আপনাদের জিলার বড় দুঃখের দিনে, বড় সঙ্কটের সময়ে, আপনারা এই সম্মেলন ডাকিয়াছেন। গেলো বছর বন্যায় আপনাদের জিলার বেশীর ভাগ জায়গা ভাসিয়া গিয়াছিল। বন্যা শুধু আসিয়াই চলিয়া যায় নাই, উহার ছাপ উহা জিলাময় রাখিয়া গিয়াছে। হাহাকার তো বন্যার সঙ্গে সঙ্গেই জিলার সবদিকে উঠিয়াছিল, আজকাল তাহা আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। বন্যার সময়েই গোয়ালন্দ মহকুমার ক্ষুধিত কৃষকেরা ক্ষুধার জ্বালা সহিতে না পারিয়া প্রায় কয়েকবার দল বাঁধিয়া মহকুমা হাকিমের নিকটে সাহায্যের জন্য গিয়াছিলেন। শুক্‌নার দিনে মাদারীপুর মহকুমার কৃষকেরাও সেই পথ ধরিয়াছেন। তাঁহারা সাহায্য, কর্জ, হালের গরু ও বীজধান প্রভৃতি চাহিয়াছেন। আজ আমরা

গোপালগঞ্জ মহকুমার এলাকায় একত্র হইয়াছি। বন্যায় এই মহকুমারও অনেক বেশী ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া গোপালগঞ্জ মহকুমার ক্ষুধিত কৃষকেরাও কিছুদিন আগে অনেক দূর দূর হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া মহকুমা হাকিমকে তাঁহাদের দুঃখ-কষ্টের কথা জানাইয়া গিয়াছেন। অমনিই তো কৃষকদের দুঃখের কোনো শেষ নাই। কিন্তু, তার উপরে যদি দেশে হাজা-শুকা হয় তাহা হইলে সেই দুঃখ যে কোথায় গিয়া পৌঁছায় তাহা চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়।

ফরিদপুরের সাধারণ অবস্থা

লম্বায় এক মাইল এবং চওড়ায় এক মাইল জায়গাকে এক বর্গমাইল বলা হয়। ফরিদপুর জিলা এই প্রকারের ২৩৫৬ বর্গমাইল জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে। গত ১৯৩১ সালে যে আদম শুমারীর রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এই জিলার তেইশ লক্ষ বাষট্টি হাজার দুই শত পনের জন লোকের বাস। ১৯৩১ সনের আগে আদম শুমারীর আর একটি রিপোর্ট ১৯২১ সালে বাহির হইয়াছিল। এই দশ বছরের ভিতরে ফরিদপুব জিলায় লোক বাড়িয়াছে প্রতি এক শত জন লোকের মধ্যে প্রায় সাড়ে ছয় জন। ঠিক এই একই সময়ে ফরিদপুরের সঙ্গে লাগা বাকরগঞ্জ জিলায় লোক বাড়িয়াছে প্রতি একশত জনে প্রায় ১৩ জন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ফরিদপুর জিলার মৃত্যুর হার উহার সহিত লাগা বাকরগঞ্জ হইতে বেশী এবং সেই জন্যই ফরিদপুরের লোকের বাড়তি বাকরগঞ্জ হইতে অনেক কম। জিলার ভিতরকার মহকুমাগুলির অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ১৯২১ হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত এই ১০ বছরের ভিতরে ফরিদপুরের সদর মহকুমায় লোক বাড়িয়াছে প্রতি এক শত জনের ভিতরে ৯ জন, গোপালগঞ্জ মহকুমায় বাড়িয়াছে প্রতি এক

শতে ৮ জন, মাদারীপুরে বাড়িয়াছে প্রতি এক শত জনে প্রায় সাড়ে সাত জন, আর, গোয়ালন্দ মহকুমায় কমিয়াছে প্রতি এক শত জনে প্রায় ৩ জন। মোটের উপরে, ফরিদপুর জিলার স্বাস্থ্য ভালো নয় এবং এই জিলার গোয়ালন্দ মহকুমা অনেকখানি ক্ষয়ের দিকে চলিয়াছে।

জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত না থাকায় গোপালগঞ্জ মহকুমায় ধানের একটির বেশী ফসল হয় না, আর, রবি শস্য তো হয় না বলিলেও চলে। জল নিকাশের সুবন্দোবস্তের জন্য কৃষকেরা কত আবেদন-নিবেদন করিয়াছেন, কিন্তু, দেশের গবর্ণমেণ্ট সেইদিকে কানও দেন নাই। কৃষকেরা নিজেদের চেষ্টায় কোন কোন জায়গায় খাল কাটাইয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহাদের এই রকম চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা তো জল নিকাশের সব ব্যবস্থা হইয়া যাইতে পারে না। এত বড় কাজ সামান্য চেষ্টায় হওয়া সম্ভবপর নহে। দেশের সরকারেরই এই কাজ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বাংলার আর আর জিলার ন্যায় কচুরী পানা ফরিদপুরেরও ফসল নষ্ট করিতেছে। ইহার জন্যও গবর্ণমেণ্ট কিছু করা দরকার মনে করিতেছে না।

ফরিদপুর জিলার একশত জন লোকের মধ্যে ৭৮ জন কৃষক।

সরকারী হিসাব হইতে দেখা যায় যে এ জিলায় গড়ে বৎসরে ৮৫ লক্ষ মন ধান পয়দা হয়। ইহার দ্বারা ফরিদপুরের লোকদের সারা বছরের খাওয়া চলে না। তাঁহাদের জন্য যতটা দরকার উহাকে চব্বিশ ভাগ করিলে মাত্র ১৭ ভাগ জিলায় জন্মায়, আর, বাকীটা বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। এই দিক হইতেও ফরিদপুরের অবস্থা ভালো নয়। খেত-মজুরের সংখ্যাও ফরিদপুর জিলায় বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২১ সালের আদম শুমারী অনুসারে খেত মজুরের সংখ্যা ছিল ২২,৭২৮ জন। ১৯৩১ সালের রিপোর্ট পড়িয়া বুঝিতে পারা যায় যে সেই সংখ্যা বাড়িয়া ১৩৩৫৯৬ জন হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা একথা পরিষ্কার

বুঝিতে পারিতেছি যে, সুদখোর মহাজন, জমীদার এবং আরও অনেকের চক্রান্তে পড়িয়া কৃষকেরা দ্রুতগতিতে ভূমিহীন হইয়া পড়িতেছেন। এখন ১৯৩৯ সাল চলিতেছে। গত কয় বছরের ভিতরে কৃষকদের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া গিয়াছে। ফসলের দাম কমিয়া যাওয়ায় কৃষকেরা দেনার জালে বিষমরূপে জড়াইয়া গিয়াছেন। আর, তারই ফলে অনেক বেশী চাষের জমিন কৃষকের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। কাজেই, খেত-মজুরের সংখ্যা ১৯১৩ সালের অপেক্ষা আরও ঢের বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু, এত লোকের কাজ কোথা হইতে জুটিবে? খেত-খামারে তো এত বেশী লোকের দরকার নাই।

এখানে খুব সংক্ষেপে ফরিদপুর জিলার কৃষকদের কথা আমি বলিলাম। কিন্তু, একথা ধরিয়া লইলে ভুল হইবে যে, শুধু ফরিদপুর জিলার কৃষকেরাই দুর্দ্দশার ভিতরে পড়িয়া গিয়াছেন, এবং অপর সব জিলার কৃষকেরা খুব ভালো অবস্থাতেই আছেন।

শোষণই দুর্দ্দশার মূল

বহুদিক হইতে বহু প্রকারের শোষণের ফলেই আমাদের কৃষকগণ আজ এই দুর্দ্দশার মুখে আসিয়া পড়িয়াছেন। ইংরেজেরা এখন আমাদের মনিব। কিন্তু, ইংরেজদের দেশের প্রত্যেকটি লোকের যদি আমরা আমাদের মনিব বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে আমরা ভুল করিব। কল-কারখানা ও বড় বড় ব্যাঙ্কের ইংরেজ মালিকেরাই আসলে আমাদের মনিব। তাহাদের শোষণের সুবিধার জন্যই তাহারা আমাদের দেশকে পায়ের তলায় দাবাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের দেশকে, বিশেষ করিয়া, আমাদের দেশের কৃষকগণকে শোষণ করিয়াই ইংরেজদের দেশ আজ এত বেশী ধনী হইয়া গিয়াছে। আমাদের বাজারের চাবি কাঠিটি পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের নিজেদের

হাতে রাখিয়া দিয়াছে। আমাদের বাজারের ভাও তাহারা ইচ্ছা করিলে চড়াইয়া দেয়, এবং যখন ইচ্ছা নামাইয়া দেয়। আবার ভাও যখন চড়াইয়াও দেয় তখনও বাড়ানো দামটা কৃষকেরা পায় না। এই বছরের পাটের দাম হইতেই আপনারা এ-কথার বিচার করিতে পারেন। পাটের দাম এবার কিছু বাড়িয়েছে বটে, কিন্তু কৃষকেরা পাট বেচিয়া ফেলিয়াছেন সস্তা দরে। অভাবের তাড়নায় পাট ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা কৃষকের ছিল না। পাট হইতে এবারে যাহারা লাভ করিতেছেন তাঁহারা হইতেছেন ব্যাপারী, আড়ৎদার ও দালাল প্রভৃতি।

কল-কারখানা ও ব্যাঙ্ক ইত্যাদির মালিক ইংরেজরা শুধু শোষণই আমাদের করে না, শোষণের জন্য শাসনও তাঁহারা করিয়া থাকে। পুলিসের শক্তি ও ফৌজের শক্তি তাহাদের তাঁবে রহিয়াছে।

আমাদের ইংরেজ প্রভুরা শুধু যে নিজেরাই নিষ্ঠুরভাবে আমাদের কৃষকদিগকে শোষণ করিয়া আসিয়াছেন তাহা নয়, তাহাদের আগমন ও শাসনের ফলে আনকেগুলি দেশীয় শোষণকারীও পয়দা হইয়াছে। প্রথমেই আমি জমীদারদের কথা বলিব। **জমীদারগণ ও জমীদারী প্রথা** ইংরেজ আমলের একটা মস্ত বড় অভিশাপ। ইংরেজ আমলের আগে জমীদারেরা তহশীলদার মাত্র ছিলেন। তাঁহারা খাজনা আদায় করিয়া একটা কমিশন মাত্র পাইতেন।

জমীর প্রকৃত মালিক ছিলেন কৃষকগণ। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ সালে কলমের এক খোঁচাতেই জমীদারদিগকে জমীর মালিক করিয়া দিয়াছেন। জমীদারেরা যে রাজস্ব সরকারকে দেন তাহা বাড়ে না, কিন্তু এদিকে প্রজার খাজনা বাড়িয়াই চলিয়াছে। বাংলা দেশে সরকার যেখানে ৩ কোটি টাকার মতো আদায় করেন সেখানে জমীদারেরা আদায় করেন প্রায় ১৬ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকৃত

কৃষকদিগকে দিতে হয় উহার অপেক্ষা অনেক বেশী। জমীতে যাঁহাদের দখলী-স্বত্ব আছে শুধু তাঁহাদের দেয় খাজনার পরিমাণই আমরা জানিতে পারি। দখলী-স্বত্ব যাঁহাদের নাই তাঁহাদের খাজনার হিসাব-নিকাশ কোথাও লেখা নাই। অথচ, বাংলা দেশে লক্ষ লক্ষ কৃষক জমীতে দখলী-স্বত্বহীন। আবার, দখলী-স্বত্বহীন কৃষকেরা খাজানা খুব উঁচু হারে দিয়া থাকেন। যে-সকল জায়গায় ফসলের দ্বারা খাজনা দেওয়ার নিয়ম আছে সে-সব জায়গায় তো কৃষকদিগকে খুবই বেশী দিতে হয়। জমীদারেরা তাহাদের মালিকানা-স্বত্বের জোরে অনেক মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি করিয়াছে। এই মধ্যস্বত্বভোগীরাই বেশীর ভাগ জায়গায় ফসলের দ্বারা খাজনা নিয়া থাকেন। বর্গাদারদিগের যে-অবস্থা আমাদের দেশে করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদিগকে খেত-গোলাম বলিলেও বিশেষ কিছু বলা হয় না। বছরের পর বছর যে-জমী কৃষকেরা চাষ করেন সে-জমীতে তাহাদের কোনো স্বত্বই নাই, ইহার অপেক্ষা হীন অবস্থা আর কি হইতে পারে?

কৃষকদের নিকট হইতে অনেক প্রকার বে-আইনী আদায়ও করা হয়। জমীদারদের ১০।১৫ টাকা মাহিয়ানার নায়েব গোমস্তারা কত রাজার হালে যে থাকেন সে-কথা তো সকলেই জানেন। কৃষকদিগকে শোষণ করিয়াই এত রাজার হালে তাঁহারা থাকিতে পারেন। এই সমস্ত ধরিয়া বাংলার কৃষকদিগকে খাজনা ইত্যাদি বাবতে বছরে বোধ হয় ৩২ কোটি হইতে ৪০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বছরে প্রায় ৬০ কোটি টাকা এ সব বাবতে বাংলার কৃষকেরা দিয়া থাকেন।

জরীপ-জমাবন্দীর দ্বারা খাজনা কি রকম বাড়িয়া যায় তাহার একটা নমুনা এখানে দিতেছি। ১৮৭১ সালে ফরিদপুর জিলার জমীর খাজনা

ছিল ১৮,৯০,৪৭৫৲ টাকা আর, ১৯৩৮ সালে সে খাজনা বাড়িয়া হইয়াছে ৫৩,২৩,৯২৫ টাকা।

কৃষকদের **দোসরা নম্বরের শোষক হইতেছে সুদ-খোর মহাজনগণ।** কৃষকদের জীবনে সুদখোর মহাজনেরা আর এক অভিশাপ। ইংরেজ আমলে যেরূপ সুদখোর মহাজনের উদয় আমাদের দেশে হইয়াছে এরূপটা ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে ছিল না ইহারা শুধু বাংলা দেশেই কিছু কৃষকদিগকে শোষণ করে না,—সারা ভারতের কৃষকদিগকে ইহারা নির্দ্দয়ভাবে শোষণ করিতেছে। নানা প্রকার চক্রান্ত করিয়া ইহারা কৃষকদের জমী হস্তাগত করিয়া লইতেছে। ভারতের যে-সকল জায়গায় জমীদারী প্রথা নাই সে-সকল জায়গায়ও কৃষকদের উপরে মহাজনের শোষণ চলিয়াছে, কৃষকেরা চাষের জমী মহাজনের হস্তগত হইতেছে। "মুরগী বাঁচিয়া না থাকিলে ডিম কে দিবে"—এই কথা ভাবিয়া মাঝে মাঝে সরকার দুই একটা আইন পাশ করাইয়া নেন বটে, কিন্তু সে-সবের দ্বারা কৃষকেরা রক্ষা পান না। আজকাল বাংলার আইন সভায় "মহাজন বিল" নামক একটি আইনের মুসাবিদা দাখিল করা হইয়াছে। ইহাতে যে কৃষকেরা ঋণের দায় হইতে বাঁচিয়া যাইবে তাহা নয়, তবে সুদখোরদের কিছু অসুবিধা যে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু, বাংলার জাতীয় সংবাদ-পত্রগুলি, যে-গুলিকে সাধারণভাবে কংগ্রেসে মুখপত্র বলিয়া গণ্য করা হয়, এই বিলটিকে উপলক্ষ করিয়া বেজায় রকম চেঁচামেচি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সব কয়খানা কাগজ একই সুরে বলিয়া উঠিয়াছে যে এই আইন পাশ হইয়া গেলে কৃষকদের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। কেন না, মহাজনেরা আর কিছুতেই কৃষকদিগকে টাকা ধার দিবে না। কিন্তু, টাকা ধার না দিলে মহাজনেরা কি করিয়া মহাজন থাকিবে সে কথা এই সংবাদপত্রওয়ালারা বলিয়া দিতেছেন না। কৃষকদের দুঃখে

তাঁহারা এত বেশী উতলা হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা ভাবিতেই পারিতেছেন না, যে-কৃষকেরা দেশের ধন-দৌলতের শতকরা নব্বই ভাগ পয়দা করেন তাঁহাদিগকে শোষণ না করিলে এই সংবাদপত্র ওয়ালাদের বন্ধু সুদখোরেরা আর কাহাকে শোষণ করিবে ?

যিনি যাহাই বলুন না কেন, একথা খুবই সত্য যে, সুদখোর মহাজনেরা কৃষকদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। জমীদারী প্রথার যেরূপ ধ্বংস হওয়া দরকার, ঠিক সেইরূপই সুদখোরী প্রথারও ধ্বংস হওয়া আবশ্যক। কৃষকদিগকে বিনা সুদে লম্বা মেয়াদের জন্য সরকারেরই টাকা ধার দেওয়া উচিত।

জমীদার ও সুদখোর মহাজন ছাড়া কৃষকদের আরও অনেক শোষক রহিয়াছে। দালাল, ফড়িয়া, আড়ৎদার, থানাদার, ডাক্তার, উকীল ও মোক্তার প্রভৃতি সকলেই কৃষকদের শোষক। কৃষক ও কলকারখানার মজুরেরা সমস্ত ধন-দৌলৎ পয়দা করেন। আর সকলে এই পয়দা করা ধন-দৌলতে ভাগ বসাইবার জন্য মেহনত করেন। তাঁহাদের মেহনতের দ্বারা কোনো ধন-দৌলৎ পয়দা হয় না।

লড়াইয়ের দ্বারা মুক্তি

ইংরেজ ধনিক শ্রেণী আজ পৌনে দুইশত বছর ধরিয়া আমাদের কৃষকদিগকে শোষণ করিতেছে। দেশীয় শোষণকারীদের শোষণও কৃষকদের উপরে নিষ্ঠুরভাবে চলিয়াছে। এই শোষণের ফলে কৃষকেরা আজ দুরবস্থার শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এই দুরবস্থার হাত হইতে রেহাই পাইতে হইলে ইহার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে। লড়াই না করিলে কৃষকেরা কিছুতেই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। কিন্তু, লড়াই কেহ একা একা করিতে পারে

না। তার জন্য দল বাঁধিতে হয়। কৃষকদিগকেও দল বাঁধিয়া লড়াই করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে **সারা ভারতের কৃষক সভা** গঠিত হইয়াছে। উহার অধীনে আবার প্রাদেশিক কৃষক সভা সমূহ গঠিত হইয়াছে। আমাদের বাংলা দেশে নিখিল ভারত কৃষকসভার শাখারূপে **বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা** গঠিত হইয়াছে। উহার অধীনে আবার জিলায় জিলায় জিলা কৃষক সমিতিসমূহ গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। এই কৃষক সমিতির ভিতরে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কৃষকদিগকে লড়াই করিতে হইবে।

প্রথমেই কৃষকদের উপস্থিত দাবী-দাওয়া লইয়া লড়াই আরম্ভ করিতে হইবে। কৃষকদের খুব ছোট হইতে ছোট অভিযোগের বিরুদ্ধেও লড়াই করার আবশ্যক হইবে। কিন্তু, সমাজের যে-ব্যবস্থার ভিতরে আমরা বাস করিতেছি সেই ব্যবস্থায় একটা আমূল পরিবর্ত্তন, একটা বিরাট ওলট-পালট না করিতে পারিলে কৃষকদের সকল দুঃখ কিছুতেই ঘুচিবে না। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে বদলাইয়া একটা নূতন ব্যবস্থার পত্তন সমাজে করিতে হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে বৃটিশ ধনিক শ্রেণী উহার পুলিশ ও ফৌজের জোরে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তাই, আগে বৃটিশ ধনিক শ্রেণীর হাত হইতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পূর্ব্বে দেশে কোনো সামাজিক ওলট-পালট হইবে না। আর, এই সামাজিক পরিবর্ত্তন না ঘটিলে কৃষকদের শোষণ মূলক প্রথাগুলিও দূর হইবে না। কাজেই, ভারতের স্বাধীনতা লাভের লড়াইয়ে কৃষকদিগকেও যোগদান করিতে হইবে। অন্য যে-সকল শ্রেণী বৃটিশ ধনিক শ্রেণীর হাত হইতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিতে চায় তাহাদের সহিতও কৃষকদের ঐক্য স্থাপন করিতে হইবে।

রাজনীতিক বন্দীর মুক্তি

কৃষকেরা যখন তাঁহাদের উপস্থিত দাবী-দাওয়ার জন্য লড়িবেন তখন **রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীও** তাঁহাদিগকে উহার সহিত জুড়িয়া দিতে হইবে। এই সকল বন্দীরা দেশের স্বাধীনতা পাইতে চান। কৃষকেরাও দেশের স্বাধীনতা চান। কাজেই, স্বাধীনতার জন্য লড়িতে যাইয়া যাঁহারা জেলে গিয়াছেন তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া আনা কৃষকদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

কৃষক-আন্দোলন ও ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িকতা

ভাই কৃষকগণ, আপনাদের আন্দোলনের সহিত যাহাতে হিন্দু-মুসলমান ঝগড়ার কথা না উঠে সেই দিকে আপনাদিগকে বিশেষ ভাবেনজর রাখিতে হইবে। কৃষক-আন্দোলন হইতেছে কৃষকদের ভাত-কাপড়ের আন্দোলন, দেশের স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন। কাজেই, কৃষক সমিতি গড়িতে যাইয়া আমরা দেখিবনা কে হিন্দু, আর, কেইবা মুসলমান। আমরা শুধু দেখিব কে কৃষক। কৃষক হইলেই আমরা তাঁহাকে কৃষক সমিতির ভিতরে আনিবার চেষ্টা করিব। কৃষক সমিতি কাহারও ধর্ম্মের কথার উপরে কোনো ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য গঠিত হয় নাই। কৃষক সমিতি গঠিত হইয়াছে কৃষকদের ভাত-কাপড়ের লড়াই লড়িবার জন্য। কাজেই, কৃষক সমিতির ভিতরে হিন্দু-মুসলমানের কথা যাহারা তুলিবে তাহারা কৃষকদের শত্রু ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিছুকাল হইতে মুসলিম লীগের লোকেরা কৃষক সমিতির কাজে বাধা দিতেছেন। মুসলমান কৃষকেরা যাহাতে কৃষকদের সভা-সমিতিতে যোগদান করিতে না পারেন তার জন্য লীগের লোকেরা চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু, কৃষকদের উচিত তাঁহাদের ভাল-মন্দ কিসে হইতে পারে তাহা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা। মুসলিম লীগ দাবী করিয়া

থাকে যে উহা সর্ব্বদাই মুসলমানদের ভালো করিতে চায়। বাংলা দেশের কৃষকদের মধ্যে খুব বেশীর ভাগ লোকই মুসলমান। কৃষক সমিতি যদি লড়াই করিয়া কৃষকদের দাবী-দাওয়া পূরণ করিতে পারে তাহা হইলে একদিক হইতে মুসলমানেরাই বেশী লাভবান হইবেন। ইহা সত্ত্বেও যে মুস্‌লিম লীগ কৃষক-আন্দোলনের বিরোধিতা করিতেছে তাহাতে লীগ যে সকল মুসলমানের বন্ধু তাহার কোনো পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান কৃষকদিগকে হিন্দু-মুসলমান শোষণ-কারীরা একইভাবে শোষণ করিয়া থাকে। শোষণ করিবার বেলায় হিন্দু শোষণকারী হিন্দু কৃষককে শোষণ করে না, কিংবা মুস্‌লিম শোষণকারী মুস্‌লিম কৃষককে শোষণ করে না, এমন তো কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কাজেই, কৃষক সমিতির ভিতরে হিন্দু-মুসলমানের কথা না তুলিয়া কেবলমাত্র কৃষকের কথাই তোলা উচিত। যে-ভাবে মুস্‌লিম লীগ মুসলমান কৃষকদিগকে কৃষক সম্মেলনে কিংবা কৃষক সমিতিতে যোগদান করিতে বাধা দিয়া থাকে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে লীগ উপরের দরজার মুসলমানদের সভা। কৃষকদের ভালো লীগ চায় না, কিন্তু মুসলমান কৃষকদের নাম করিয়া উচ্চস্তরের মুসলমানদের কতকগুলি সুখ-সুবিধা লীগের লোকেরা করিয়া লইতে চান মাত্র।

ফ্লাউড্ কমিশন

বাংলার গবর্ণমেণ্ট একটি ভূমি-রাজস্ব বিষয়ক তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটির সভাপতির নাম সার ফ্রান্সিস্ ফ্লাউড বলিয়া ইহাকে ফ্লাউড্ কমিশনও বলা হয়। ফ্লাউড্ কমিশনের তদন্তকে উপলক্ষ করিয়া জলপাইগুড়ির প্রাদেশিক সম্মেলনে এই বলিয়া একটি প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে যে জমীদারী প্রথা তুলিয়া দেওয়া হউক, কিন্তু তার জন্য জমীদারদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হউক। বঙ্গীয়

প্রাদেশিক কৃষক সভা এই মতের সমর্থন কিছুতেই করেন না। জমীদারেরা গত ১৪৬ বছর ধরিয়া কৃষকদের যে-ক্ষতি করিয়াছে তাহার পূরণ কে করিবে তাহা আমরা জানিতে পারি কি? নূতন শাসন সংস্কার আইন অনুসারে বাংলা কিংবা ভারত সরকার জমীদারী প্রথা তুলিয়া দিতে পারিবে না। ইংরেজদের দেশে ইংরেজ ধনীদের পার্লিয়ামেণ্ট নামক যে আইন সভাটি আছে উহাই শুধু জমীদারী প্রথা ইচ্ছা করিলে তুলিয়া দিতে পারে। ফ্লাউড কমিশন যদি ক্ষতিপূরণ দিয়া জমীদারী প্রথা তুলিয়া দিবার সুপারিশ করেন, আর, সেই সুপারিশ যদি পার্লিয়ামেণ্ট মানিয়া লয় তাহা হইলে ক্ষতিপূরণের টাকাটা আমাদের কৃষকদিগকে দিতে হইবে। যে-দেশে ধন-দৌলতের একশত ভাগের ৯০ ভাগ কৃষকেরা পয়দা করেন সেই দেশে কৃষক ছাড়া আর কে যে ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন তাহা তো আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মোট কথা, জমীদারদিগকে কোনো প্রকারের ক্ষতিপূরণ আমাদের কৃষকগণ দিতে পারিবেন না। কারণ, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন ক্ষমতা আমাদের কৃষকগণের আর নাই। কাজেই, জমীদারী প্রথা তুলিয়া দেওয়ার জন্য যেমন জোরের সহিত আন্দোলন চালাইতে হইবে, ঠিক্ তেমনই জোরের সহিত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিরুদ্ধেও আমাদিগকে আন্দোলন চালাইতে হইবে।

আগামী শীতকালে খুব সম্ভবতঃ ফ্লাউড্ কমিশনের সভ্যেরা বাংলার জিলায় জিলায় ঘুরিয়া বেড়াইবেন। সেই সময়ে জিলা কৃষক সমিতির নেতৃত্বের অধীনে প্রত্যেক জিলার কৃষকগণ যেন দলে দলে কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দাবী-দাওয়া পেশ করেন। কৃষকদের মধ্যে যে একতা ও শক্তি আছে তাহা ফ্লাউড্ কমিশনকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।

কৃষক আন্দোলন ও বাহিরের জগৎ

আজ যে আমরা এখানে বসিয়া কৃষক আন্দোলন করিতেছি ইহার ঢেউ ভারতবর্ষের সকল জায়গায় যাইয়া পঁহুছিতেছে। যদি আমরা সারা ভারতের জন্য **নিখিল ভারত কৃষক-সভা** গঠন করিতে না পারিতাম তাহা হইলে এইরূপ কখনও হইতে পারিত না। কিন্তু, কৃষকগণের শুধু কৃষকদের লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না, কল-কারখানার মজুরদের সহিতও তাঁহাদিগকে একতা স্থাপন করিতে হইবে। মজুরেরা সংখ্যায় কম হইলেও তাঁহারা মোক্ষম জায়গাগুলিতে বসিয়া আছেন। জাহাজ ও রেলগাড়ী তাঁদের দ্বারা চলে, লোহা ও ইস্পাতের কারখানা তাঁহারা চালান এবং খনি হইতে তেল ও কয়লা তাঁহারা তোলেন। এই সব না হইলে আমাদের সবই কাজ অচল হইয়া যায়। কাজেই, মজুরেরা যত সহজে ইংরেজ ধনিকদের মর্ম্মস্থানে ঘা দিতে পারিবে তত সহজে কৃষকেরা পারিবে না। এই জন্য, মজুরদের সহিত একটা ঐক্য স্থাপন করা কৃষকদের পক্ষে খুবই আবশ্যক।

বাহিরের জগতের খবরও কৃষকদিগকে রাখিতে হইবে। কি করিয়া স্পেনের কৃষক ও মজুরেরা লড়িয়াছে এবং কত সাহসের সহিত চীনের মজুর ও কৃষকগণ শক্তিশালী জাপানের বিরুদ্ধে আজ লড়াই করিতেছে, এ সব খবর আমাদের কৃষকগণের জানা দরকার। বিশেষ করিয়া, সোভিয়েট রাশিয়ার খবর আমাদের কৃষকগণের জানা একান্ত আবশ্যক। সোভিয়েট রাশিয়া সমস্ত দুনিয়ার ছয় ভাগের এক ভাগ। এই বিরাট দেশে মজুর ও কৃষকগণের ক্ষমতা স্থাপিত হইয়াছে। আমার এই বক্তৃতায় সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে সকল কথা বলা সম্ভবপর নহে। যে-সকল শিক্ষিত বন্ধুরা আপনাদের মধ্যে কাজ করিতে

আসেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে আপনারা সোভিয়েট রাশিয়ার কথা অবশ্যই শুনিয়া লইবেন। রাশিয়ার মজুর ও চাষীদের কথা যতই আপনারা শুনিবেন ততই আপনাদের বুকে সাহস ও বল বাড়িবে।

কৃষক বন্ধুগণ, আমার বক্তৃতা আমি এখানেই শেষ করিলাম।

কৃষক আন্দোলন সফল হউক!

জমীদারী প্রথা ধ্বংস হউক!

সুদখোরী প্রথা ধ্বংস হউক!

সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শোষণ ধ্বংস হউক।

জয়, স্বাধীন ভারতের জয়।

জয়, লাল নিশানের জয়!

ইন্‌কিলাব্‌ জিন্দাবাদ।

——::——

রেবতী বর্মণ

—বাঁকুড়া ও বীরভূম—

সমবেত কৃষক ভাইগণ,

বাঁকুড়া জেলা বাংলার পশ্চিম দিককার শেষ সীমানা। দারিদ্র্যেরও এখানে একশেষ। বিশেষজ্ঞদেরই অভিমত, ইঁদুর যে খাদ্য খাইয়া বাঁচিতে পারে না বাংলার কৃষকেরা তাই খাইয়া থাকে। এ জেলা সকলের চেয়ে দরিদ্র, সুতরাং এখানকার লোকের যে কি দুরবস্থা তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা সাধারণত কত আয় আমাদের, তাহার তুলনা করি বিদেশের লোকের আয়ের সঙ্গে। কিন্তু উচিত হইবে, আমাদের জানোয়ারগুলি যাহা খায়, তাহার সহিত তুলনা করা। দারিদ্র্যের শেষ সীমানায় পা রাখিয়া আমরা কোনপ্রকারে দিনাতিপাত করিতেছি। যখন আর পারিব না এক পা বাড়াইয়া দিয়া সকল জ্বালা মিটাইব। কৃষক রোগযন্ত্রণায় ছটফট্ করিয়া মরে, অথবা আত্মহত্যা করে। মরিয়াই যেন সে বাঁচে।

এ জেলার লোকেরা গরীব বটে, কিন্তু এখানে কি সকলেই গরীব? ধনী এখানে নাই? কৃষক নিজেই ইহার জবাব দিবে, ধনীই যদি না থাকে, আমি গরীব হইলাম কি প্রকারে? পয়দা করি প্রচুর, কিন্তু ইহার বিন্দুমাত্র আমার কাজে আসে না। একটি ভারবাহী বলদের যতখানি খাওয়া প্রয়োজন, ততখানি খাই আমি; আর একটি সিংহের যতখানি প্রয়োজন, ততখানি খায় ধনী। বড় বড় বাড়ী আমার তৈয়ারী, জমির চাষ আমার হাতের, সূতা-কাপড় আমার মেহনতের, কিন্তু তবুও অনাহারে আমি হাহাকার করি। আশ্রয়ের অভাবে ঘুরিয়া বেড়াই; গাছের পাতায় লজ্জা নিবারণ করি। দুনিয়ার কৃষক ও মজুর মিলিয়া সবই তৈয়ারী করিয়াছি; কিন্তু তাহাদের বলিতে কিছুই নাই। বাঁকুড়ার কৃষকের কি এই বোধ জন্মায় নাই? এমনও কি এখনো কেউ আছেন, যিনি ভাবেন আমার দুর্দশার জন্য দায়ী আমার কপাল

অথবা কর্মফল? আপনাদের নিশ্চয়ই আজ এই জ্ঞান জন্মিয়াছে, গুটিকয়েক লোক সকল ধন-সম্পত্তি আঁকড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়াই, বেশীর ভাগ লোক আজ কাঙ্গাল। একবার একজন কৃষককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বড় লোক কি তোমার ভাল কখনো চিন্তা করে না? জবাব হইল, "বাবু, ওদের পেটে আছে কেবল ছোট লোকের সর্বনাশের দুষ্টবুদ্ধি।" স্ত্রীপুত্র সহ দুইদিন অনাহারে রহিয়াছে এমন একজন কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তোমার কি হইবে? সে বলিল, ধানের জন্য কয়দিন মহাজনের নিকট ঘুরিতেছি। তার ধারণা মুল্লুকটা বুঝি একই রকম চলিতেছে। কৃষকের আজ চেতনা ভালভাবেই জন্মিয়াছে। সমাজে দুইটী শ্রেণী—বড় ও ছোট; একটী সংখ্যায় কম, অপরটী সংখ্যার বেশী; একটীর জীবন অলস, অপরটীর জীবন কাজের; একটী কাল কাটায় বিলাসিতায়, অপরটী দিনতিপাত করে অনাহারে। একটী ভোগ করে, অপরটী পয়দা করে। একটীর অস্তিত্বের মূল জুলুম-জবরদস্তি, অপরটীর জীবনের বোঝা লাঞ্ছনা, অপমান। একজন বড়লোকের হয়ত বা মাথা ধরিয়াছে; ডাক্তার আসিয়া বলিল, মনটাকে একটু অন্যদিকে আকৃষ্ট রাখিতে হইবে। বড় লোকের অদ্ভুত খেয়াল হইল, দশহাজার লোককে ধরিয়া আনিয়া গুলি করিয়া মারিয়া তামাসা উপভোগ করিতে হইবে। এই তাজ্জব হুকুম তামিল হইতে আর কতক্ষণ? সত্য সত্যই রুশিয়া দেশের জার একরকম করিয়াছিল।

বন্ধুগণ, আজ আপনাদের অবস্থাটা বুঝিয়া লউন। যারা বলেন সমাজে এরকম নিয়ম নাই, তারা যে কতখানি সত্যের অপলাপ করিতেছেন তাহা কি আপনারা বুঝেন না? ইহাদের এরূপ করার উদ্দেশ্য কি? আপনারা যে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতেছেন এবং নূতন চেতনা লাভ করিতেছেন তাহা এই শ্রেণীর লোকের নিকট ভয়ের কারণ। তাহাদের অদ্ভুত খেয়াল চরিতার্থ হইবে না। আপনাকে যে সর্বস্বান্ত করিয়া

তামাসা দেখিবে তাহার সুযোগ হইবে না। আপনার ক্ষুধাতুর সন্তানের কান্নায় হাসিবে অথবা উপহাস করিবে, সেরূপ সুবিধা হইবে না। তাই'ত তাদের দুঃখ, ভয়। দুইটী শ্রেণী—দুয়ের ভিতরে লড়াই চলিয়াছে। খালিপেটের সঙ্গে ভরাপেটের আজ এই লড়াই কেহ অস্বীকার করিতে পারে কি? যে করে সে অন্ধ, নয়ত স্বার্থান্ধ।

ইংরাজ ও জমিদার

গরীব আর ধনী অনেককাল আগে হইতেই আছে। কিন্তু কোন কালেই গরীব না খাইয়া মরে নাই। আগের দিনে কাহাকেও অভুক্ত থাকিতে হইত না, কৃষক বলিতে বুঝি যার জমি আছে, লাঙ্গল আছে। আজ এরূপ কৃষক খুবই কম, জমিহীনের সংখ্যাই আমাদের সমাজে আজ বেশী। ১৪৬ বছর আগে জমির মালিক ছিল কৃষকই। আজ যাদের আমরা জমির মালিক বলি, তারা তখন রাজার তহশীল করিত। এই তহশীলদারেরা যেন কোন প্রকারে প্রজাকে উৎপীড়ন না করিতে পারে, তার সুব্যবস্থা ছিল, গ্রামে গ্রামে পাটোয়ারী ছিল, কাননগো ছিল। এরা কৃষকের জমির স্বত্ব কাগজপত্রে লেখা রাখিত। গ্রামগুলি ছিল ভারী সুন্দর, সকলের চাষ-বাসের জমি ছিল, আবার কতক কতক সম্পত্তির উপরে ছিল সকলের সমান অধিকার। গ্রামের পুকুর, গ্রামের জঙ্গল, গোচারণভূমি, গ্রামস্থলী—এগুলি কাহারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। এরকম জীবনকে তখন বলা হইত সমবায় জীবন। যদি কখনো বৃষ্টি কম হয়, অথবা বেশী বৃষ্টি হইয়া ফসল ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাই গ্রামের ভিতরে কৃষকদের ছিল ধর্মগোলা, সুবছরে তারা ধান মজুত করিয়া রাখিত; অজন্মা হইলে কেহ যেন অভুক্ত না থাকে, এইরূপ ব্যবস্থা এখনকার দিনে হয়ত বা কল্পনার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আপনারা আমাকে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করিবেন,—১৪৬ বছর আগে যদি

কৃষকই জমির মালিক ছিল, তবে কি করিয়া আমরা স্বত্ব হারাইলাম। এই ইতিহাস অত্যন্ত মর্মান্তিক। বিদেশ হইতে একদল বণিক আসে আমাদের দেশে। ধীরে ধীরে এরা যখন টাকাওয়ালা হইয়া উঠিল তখন আর ইহাদের রোখে কে? অবশ্য সদ্ভাবে ব্যবসায় ইহারা কখনো করে নাই। বাংলার নবাব, দিল্লীর বাদশা সকলই এই বণিকদের পদানত হইল, বাংলার জমিদারী হাতে পাইয়া প্রজাকে যথেচ্ছ শোষণই হইল এখন হইতে তাদের কাজ। আগে নিজের দেশ হইতে টাকা আনিয়া এদেশে মাল কিনিত। এখন আর তার প্রয়োজন নাই। এদেশের প্রজার রক্ত শুষিয়া, খাজনা আদায় করিয়া তাই দিয়া এদেশের কাঁচামাল, মশলা প্রভৃতি কিনিয়া স্বদেশে পাঠাইতে লাগিল, নূতন শাসকেরা পাগ্‌লা হইয়া উঠিতে লাগিল—কিসের দুর্ভিক্ষ, কিসের বিক্ষোভ—যত পার শুষিয়া লও।

এই অনাচারে দোসর পাইল জমিদারদের। এদের সঙ্গে আমাদের বিদেশী শাসকেরা বন্দোবস্ত করিল—জমির মালিক তোমাদের করিয়া দিলাম। তোমরা যা পার আদায় কর, আমাদের বছরে সোয়া দুই কোটি আন্দাজ টাকা দিলেই চলিবে। জমিদারদের এখন মজা লুটিবার সুযোগ আসিল। আজ হইতে এরা জমির মালিক, আর চাই কি? জমিদারেরা তাদের মনিবদের নিকট নালিশ জানাইল—কতকগুলি নূতন আইন না করিলে কাজের অর্থাৎ আদায়-তহশীলের সুবিধা হইতেছে না, এদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে সরকার কালবিলম্ব করিল না। আইন হইল, আইনের নাম হইল—পঞ্চম, হপ্তম; পাঁচধারা, সাতধারা। জমিদার এখন হইতে প্রজাকে বকেয়া খাজনার জন্য কয়েদখানায় পুরিতে পারিবে, ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবে। আগে বলিয়াছি, সকলের অধিকারের সম্পত্তির কথা; সেগুলি জমিদার নিজের সম্পত্তি করিয়া লইল। ইচ্ছামত এক প্রজাকে সরাইয়া অপর প্রজার নিকট

জমি পত্তন সুরু করিল। কতদিন যে জমি প্রজার দখলে থাকিবে—কেহই সে সম্পর্কে নিশ্চিত থাকিতে পারিত না, এভাবে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হইল ; কৃষকের সমবায়-জীবননীতি ভাঙ্গিয়া গেল ; সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হইল। ইংরাজের বন্দোবস্ত আর জমিদারের উৎপাত—দু'য়ে মিলে এদেশে জমিহীন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করিল। কৃষক চাষ করিবে কি, জমি ছাড়িয়া পালাইতে পারিলেই সে বাঁচে।

বাঁকুড়ার যে এলাকায় আজ সম্মেলন বসিয়াছে, সেখানে অনেকেরই জমি নাই। জমি যদি থাকিত, নিশ্চয়ই আপনারা জমি চাষ করিতেন। কিন্তু জমি নাই বলিয়াই আজ নিরুপায় হইয়া কারখানায় অথবা কয়লার খনিতে আপনারা কাজ করিতে যান। জমিদারদের অত্যাচারে ইংরাজের সুবিধা হইয়া গেল। জমিচ্যুত একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হইল বলিয়াই ইংরাজ এদেশে কল-কারখানা স্থাপন করিতে পারিয়াছে। জমিদাররা জমিহীন জাতের সৃষ্টি করিয়া তাদের ইংরাজ প্রভুদের মস্ত উপকার করিয়া দিল। কুলি-মজুরের জাত সৃষ্টি না হইলে কল-কারখানা চালাইবে কে ?

বন্ধুগণ, আপনারা কি বুঝিতে পারিতেছেন—আপনারা যে আজ দরিদ্র তার মূল জমিদারী-প্রথা ; আপনারা যে জমিহীন তার মূল জমিদারী-প্রথা ; আপনারা যে কুলি-মজুর তার মূল জমিদারী-প্রথা ? এই প্রসঙ্গে ইহা ত আপনারা বুঝিতেছেন—জমিদার আর ইংরাজ সরকারের প্রকৃত সম্বন্ধটা কি? ইংরাজ জমিদারকে সৃষ্টি করিয়াছে, জমিদার ইংরাজ-শাসকের হইয়া আপনাকে শোষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

জমি ও জমা

বন্ধুগণ, বাংলাদেশের জমি ও জমা সম্পর্কে মোটামুটি একটি চিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। ইহা হইতেই এদেশে শোষণের

নমুনা সম্পর্কে আমরা ধারণা করিতে পারিব। চাষের জমি এদেশে ২ কোটী ৮৯ লক্ষ একর। ৬০ লক্ষ একর দো-ফসলা। ধানের জমি ২ কোটী ৫৭ লক্ষ একর। পাট চাষ হয় ২০ লক্ষ একর জমিতে। সারা বছরে ধান হয় ৯৩ কোটী টাকার, আর পাট ১৬ কোটী টাকার। ধানের জমির প্রতি একরে ফসলের মূল্য ধরা যাইতে পারে ৩৬৲ টাকা; আর পাটের জমির ৭৩৲ টাকা; পাট, ধান এবং অন্যান্য সকল প্রকার ফসলের মোট মূল্য ধরা যাইতে পারে ১৪০ কোটী টাকার উপর। গড়পড়তা হিসাব লইলে দেখা যায় প্রতি একর জমিতে ফসল উৎপাদন হয় ৪৪৲ টাকার।

মোট জমির ৮৪·৯ ভাগ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন; ৭·২ ভাগ অস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন; বাকী ৭·৯ ভাগ সরকারের খাস-মহাল। প্রথমোক্ত জমির জন্য সরকারের প্রাপ্য মাত্র ২ কোটী ১০ লক্ষ। অস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে সরকার রাজস্ব পায় ২০ লক্ষ; আর খাস-মহালের আয় ৭০ লক্ষের কিছু উপর। বাংলার মোট ভূমি-রাজস্ব ৩ কোটী ১০ লক্ষের কিছু উপর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন প্রতি একর জমিতে জমিদার রাজস্ব দিয়া থাকে পনর আনা। কিন্তু জমিদার মোট খাজনা আদায় করে ১৫ কোটী টাকার মত; প্রতি একরে ৩৲ টাকা। আপনাদের এ অঞ্চলে ৫৲।৬৲ একর প্রতি খাজনার হার।

জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের খাস-জমির পরিমাণ ৪০ লক্ষ একর। ভাগ-চাষ বন্দোবস্ত অথবা দিনমজুর খাটাইয়া মালিকেরা এ সকল জমি চাষ করায়।

আবাদী জমির পরিমাণ গত কয়বছর প্রায় একই আছে; অথচ লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে বাড়িয়াছে একশত'র উপর। উপরের এই চিত্রটি আমাদের কতকগুলি জিনিস বুঝিতে সহায়তা করিবে। ১৯৩০ এর পূর্বে ফসলের দাম ২০০ কোটীর উপর ছিল। কিন্তু হঠাৎ ফসলের দাম শতকরা ৩০৲।৪০৲ টাকা কমিয়া গেলেও এই কয়বছরে

জমিদারেরা জমাবৃদ্ধি করিয়াছে শতকরা ১২॥০ টাকা ; ফলে কৃষকের বহু জমি হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াছে।

সেটেলমেণ্টের রিপোর্ট অনুসারে ধরিতে গেলে, ফসলের খরচা মোট মূল্যের অন্তত অর্ধেক ; অর্থাৎ ১০০৲ টাকায় ৫০৲ টাকা, জমিদারদের খাস জমির পরিমাণ মোট আবাদী জমি হইতে বাদ দিলে, চাষীর জমির ফসলের মোট মূল্য হয় ১১০ কোটী টাকার মত, তার অর্ধেক ফসলের খরচ। অর্থাৎ বাকী ৫০।৬০ কোটী টাকার উপরে জমিদারেরা খাজনা আদায় করে ১৫ কোটী টাকার মত। এই হিসাব হইতে আবার আমরা দেখিতেছি প্রতি চাষীর আয় ১৫৲ হইতে ২০৲র উর্ধে কিছুতেই যাইতে পারে না। চাষী যে শুধু খাজনাই দিতেছে তাহা নয়। ২০।৩০ কোটী টাকার মত আবওয়াব কৃষকের নিকট হইতে জমিদারেরা আদায় করিয়া থাকে। জমিদারদের খাস জমির পরিমাণ ৪০ লক্ষ একর ; খাস জমির নেট লাভ ১৫ কোটী টাকা। তাহা হইলে বাংলার জমিদারদের আয় খাজনা বাবদ ১৫ কোটী, আবওয়াব বাবত ২০ কোটী, আর খাসজমি বাবদ ১০ কোটী। কমপক্ষে এরা মোট আদায় করে ৪৫ কোটী টাকা। কৃষকের হাতে ফসলের খরচা বাদ দিয়া থাকে ৭০ কোটী টাকা। কি সাংঘাতিক ! এর ভিতর হইতে ৪৫ কোটী টাকা জমিদার আত্মসাৎ করে। এখন আমাদের মোটেই বুঝিতে কষ্ট হয় না, কেন আমাদের কৃষক ঋণগ্রস্ত, কেন কৃষকের জমি ক্রমেই অপর হাতে চলিয়া যাইতেছে, কেন গত ৮ বৎসরে ১০০ কোটী টাকার জমি বন্ধক ও বিক্রয় হইয়াছে। আজ কৃষকের ঋণ ২০০ কোটী টাকার উপর ; বাকী খাজনা সহ নিশ্চয়ই এর পরিমাণ আরো বেশী। অথচ কৃষকের হাতে যে জমি আছে তার মোট বাজার-দর আজকালকার দিনে ২০০ কোটী টাকার মতই হইবে। কৃষকের সম্পত্তি আর কৃষকের ঋণ যদি সমান হয়, তবে আমাদের বাংলার কৃষককে দেউলিয়া ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে।

বাঁকুড়ার কৃষক

এখানে আপনাদের জেলার কথা বলিব। আপনাদের লোক-সংখ্যা ১১ লক্ষের উপরে। সাঁওতাল পরগণার উঁচু জায়গা আর বাংলার সমতলভূমি—এই দুয়ের মাঝখানে আপনাদের জেলা, যারা উপার্জন করে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৪৪ তাদের অংশ। শুধু চাষ হইতেই নয়, কিছু কিছু লোক কুটীর-শিল্প অথবা কারখানায় কাজ করিয়া জীবিকা চালায়। এ জেলায় মোট জমি চাষ হয় ২৭,৫০০ একর; তার ভিতরে ৩·৭ ভাগ মাত্র দো-ফস্‌লা। শালি আর শুনা—এই দুই রকমের জমি এ-জেলায়। মোট জমির মাত্র ৪৪ ভাগ আবাদ হয়, ৯০ ভাগ জমিতেই ধানের চাষ।

১১ লক্ষের ভিতর সোয়া তিন লক্ষ লোক জীবিকার জন্য নির্ভর করে জমির উপর। যারা শুধু খাজনা আদায় করে তাদের সংখ্যা ৬০ হাজার। জমিতে যাদের দখলী-স্বত্ব আছে তারা এক লক্ষের উপর। কোর্ফা রায়ত প্রভৃতি সত্তর হাজার; কৃষি-মজুরের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬ শত।

১৯৩৪এ জেলার ছয়টি মৌজার অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে, প্রতি পরিবারের প্রায় ৮ বিঘা জমি। প্রতি পরিবারে গড়পড়তা লোক প্রায় ৭ জন; উপার্জন করে ২ জন। আয় ১৯২৮ সনে ছিল ১৪৬৲ টাকা, খরচ ছিল ২৬৭৲ টাকা। ১৯৩৩এ আয় নামিয়া দাঁড়াইয়াছে ৮৬৲ টাকায়, অথচ খরচ ১৬৯৲ টাকা। প্রত্যেক পরিবারের ঋণ ২৪৪৲ টাকা হইতে ৩০৪৲ টাকা। শতকরা ২০টি পরিবারের ঋণ নাই; বাকী সকল পরিবারেরই ২ বছর,৩ বছরের আয়ের সমান ঋণ। এ কয় বছরে শতকরা ১১৬৲ ঋণ বাড়িয়াছে।

রায়পুর শিমলির একটা গড়পড়তা হিসাব উপস্থিত করিতেছি। ১৯২৮এ আয় ৫৩৲ টাকা, খরচ ২৭২৲ টাকা, ঋণ ১০৫৲ টাকা। ১৯৩৩এ

আয় ১৭৲ টাকা, খরচ ১৭৩৲ টাকা, ঋণ ১৬৫৲ টাকা। ১৯২৮এ একমাত্র বাঁকুড়া-শালবনীতেই দেখা গিয়াছে খরচের চেয়ে আয় ছিল বেশী; ২২৮৲ টাকা আয়, ১৯৭৲ টাকা খরচ। ১৯৩৩এ কিন্তু ইহা ঘুরিয়া গেল; আয় ১৬৮৲ টাকা, খরচ ২২৭৲ টাকা। ঋণ ১৯২৮এ ছিল ১৮২৲ টাকা; ১৯৩৩এ তাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ৫৪২৲ টাকা।

কৃষক যেখানে এত দুর্দশাগ্রস্ত, সেখানে যে জমি বিক্রয় ও বন্ধক বাড়িয়া যাইবে তাহা না বলিলেও চলে। ১৯৩০ হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত এ জিলার হিসাব লইলে দেখা যাইবে বিক্রয় এবং বন্ধকের পরিমাণ বছর বছর বৃদ্ধিই পাইয়াছে। ১৯৩০এ ১০০৲ টাকার মূল্যের নীচে জমি বিক্রয় হইয়াছে ৬৪টী; ১৯৩৪এ ১০২টী। শতকরা কত বৃদ্ধি পাইয়াছে এখন সহজেই আমরা তাহা ধরিতে পারিব। ১৯২৮ হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত ১০০৲ টাকার নীচের মূল্যের জমি হস্তান্তর হইয়াছে ১,৩৫৩,৫০৪৲ টাকার। ১০০৲ টাকার উপরে ১০,৬৮০,৩৯১৲ টাকার জমি বিক্রয় হইয়াছে। বন্ধকের পরিমাণ ১০,৩৯০,০৯৫৲ টাকা। বাঁকুড়া জিলায় মোট এই কয় বছরে জমি বিক্রয় ও বন্ধক দেওয়া হইয়াছে ২২,৪২৩,-৯৯০৲ টাকার। সেটেলমেণ্ট রিপোর্টে অনেকের আয়ব্যয়ের হিসাব দেওয়া আছে। অনেকগুলি নাম হইতে আমি মাত্র একজনের নাম বাছিয়া লইব। জাহাদ মল্লিকের চাষের জন্য মজুর খরচ ১৫৲ টাকা। নিজের মজুরীর মূল্য ৪৫৲। বীজধান, গরু, লাঙ্গল প্রভৃতির খরচ ১৪৲ টাকা। সেচের জন্য খরচ ৩৲ টাকা। বৎসরান্তে দেখা গেল, মোট ফসলের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৩৫৪৲ টাকা। জাহাদ মল্লিকের চাষ ছাড়া অন্যপ্রকার কোন আয় নাই। খরচ বাদ দিয়া তাহার হাতে থাকে ২৭৪৲ টাকা। ১৬০৲ পরিমাণ জাহাদ মল্লিকের ঋণ, প্রতি বছর তাকে সুদ বাবদ দিতে হয় ৩০৲ টাকা, তাছাড়া অন্তত ১০ একর জমিতে তার চাষ হয়; তারজন্য খাজনা দিতে হয় ৪০৲ টাকা। সব বাদ দিলে

বছর ২০০৲ টাকা তার হাতে থাকে। অথচ একমাত্র খাওয়া-খরচই তার পরিবারের ৩৬০৲ টাকা, পোষাক-পরিচ্ছদের কথা না-ই আনিলাম। যে সময়ের হিসাব লওয়া হইয়াছিল, তখন সুসময় ছিল, কৃষকের এত অনটন ছিল না ; বর্তমান সময়ের সংকটে ইহা আরো কত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

সংকট ও সংগ্রাম

দেশের শতকরা নব্বই জন লোক আজ দেউলিয়া, নিঃস্ব, নিরন্ন। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে কখনো আধুনিক সময়ের শিল্পোন্নতি অথবা সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপ অবস্থার মূল কারণ কি তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। সরকার ও জমিদার—এই দুয়ের দাবী ও আব্দার মিটাইতে গিয়া কৃষকের আজ এত দুরবস্থা।

ইতিহাসের নজীর আপনাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছি, অঙ্কের হিসাব আপনাদের দেখাইয়াছি। আপনাদের অবস্থার সত্যকার চিত্র আপনারা দেখিয়াছেন। শোষক আর শোষিতের সম্পর্কই আজ প্রধান। এই অবস্থার সম্মুখে মুষ্‌ড়াইয়া পড়িলে চলিবে না, প্রতিকারের পথ খুঁজিয়া বাহির করাই ইহার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, সংকট হইতে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় সংগ্রাম। আপনাদের সম্মুখে দুই রকমের সংগ্রাম। প্রতিদিনের দাবী-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ মিটাইতে গিয়া আপনাদের বেগ পাইতে হয় কম নয়। কৃষকের শ্রেষ্ঠ অভিযোগ আজ, ফসলের দাম কমিয়াছে, অথচ খাজনা বাড়িল কোন্ নীতি অনুসারে। যে পরিমাণ দাম কমিয়াছে, ঠিক ততখানি খাজনা কমাইয়া দিতে হইবে। আপনাদের জেলায় ঠিকমত বৃষ্টি হয় না, তাতে ফসলের অত্যন্ত ক্ষতি হয়, সেচ্ কার্যে গভর্ণমেণ্টের অবহেলা সুবিদিত। নদ-নদী, নালা হাজিয়া মজিয়া যাওয়ায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায় ; জলপথ বন্ধ হইয়া যায়। কোন কোন অঞ্চলে সেচ কার্যের অভাবে পয়ঃপ্রণালী বন্ধ হইয়া যাওয়ায়

জলা জায়গার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। উপযুক্ত বাঁধের অভাব মস্ত একটা অভিযোগ। বর্তমানে যে সকল বাঁধ আছে, সেগুলি ভাঙ্গিয়া গেলে সংস্কারের কোন সুব্যবস্থা নাই। সরকারের সেচবিভাগের কাজের পিছনে আছে লাভের উদ্দেশ্য। আপনাদের আজ মস্ত একটা দাবী হইবে নদী-নালার সংস্কার এবং উপযুক্ত জল-সরবরাহের ব্যবস্থা। বাঁকুড়া জিলায় এখনো চাষের যোগ্য অনাবাদী জমি পতিত রহিয়াছে ৩৮২,৮৩৩ একর। যারা দিনমজুর তারা স্বচ্ছন্দে আজ দাবী জানাইতে পারে, এই জমিতে তাদের চাষের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হউক। প্রতিদিনের এই অভিযোগ ত আছেই; তাছাড়া বৃহত্তর সংগ্রামের জন্যও বাংলার কৃষককে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই বৃহৎ সংগ্রামই স্বাধীনতার লড়াই। এই লড়াইয়ে কৃষকের স্থান যে কত বড় তাহা বলিলেও চলে। যে দেশে শতকরা নব্বইজন লোক কৃষক, সে-দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে যে কৃষকের অংশ খুবই বড় হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। বস্তুত, বর্তমান অবস্থায় স্বাধীনতার লড়াইয়ে কৃষকের দাবীই সকলের সম্মুখে রাখিতে হইবে। জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ চাই—এইটাই বর্তমান স্তরে শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দাবী। কৃষককে এই অবস্থাটা সম্পর্কে সজাগ হইতে হইবে; অপরদিকে যারা কৃষককর্মী অথবা স্বাধীনতাকামী তাদের ইহার গুরুত্ব বুঝিতে হইবে। ছোট-বড় সকল দাবী আজ মিটাইয়া লওয়ার সময় আসিয়াছে। কালবিলম্ব করিলে মৃত্যু এবং ধ্বংসকেই আমরা ডাকিয়া আনিব। সংকটের সম্মুখে নিরাশ হওয়ার কোন অর্থ হয় না; নিষ্কৃতির জন্য সংগ্রামই শ্রেষ্ঠ উপায়।

সমিতি

বন্ধুগণ, কিসের উপর দাঁড়াইয়া আমরা লড়িব। আমাদের বনিয়াদ কি? বাংলাদেশের জিলায় জিলায় কৃষকের সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমিতিই কৃষকের মিলিবার স্থান, দাঁড়াইবার স্থান। সমিতিই

আমাদের লড়াইয়ের অস্ত্র। ভবিষ্যতের নূতন সমাজের জন্য সমিতিই আমাদের মূল-কাঠামো। সমিতির মধ্য দিয়াই অন্যান্য স্বাধীনতা-কামীদের সঙ্গে আমরা সংযুক্ত হইব? স্বাধীনতা অর্জন হইলে এই সমিতির মধ্য দিয়াই আমরা প্রকৃত পঞ্চায়েত-শাসন গড়িয়া তুলিব। মালিকশ্রেণী তখন থাকিবে না, কেহ মনিব সাজিয়া আসিয়া আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিবে না। পূর্বে যেমন সমবায় গ্রামের কথা বলিয়াছি, তেমনি সমবায়ের উপর আমরা আমাদের জীবনকে গড়িয়া তুলিব। তবে তখনকার চেয়ে আমাদের ধনদৌলত, সুখ-সম্ভোগ অনেক বেশী বাড়িয়া যাইবে। কেননা, কল-কারখানা রহিয়াছে, জমিতেও চাষের জন্য আধুনিক যন্ত্র চালানো যাইতে পারে। এগুলোকে আমরা কাজে লাগাইব। বর্তমান সময়ে আমরা যন্ত্রের ও কলের দাস। কিন্তু যখন আমাদের সমাজ নূতনভাবে গড়িয়া উঠিবে, অর্থাৎ সমিতির শাসন প্রতিষ্ঠা হইবে, তখন কলই হইবে আমাদের দাস। বন্ধুগণ, এইরূপ সমাজ কি কল্পনার বিষয়মাত্র! আমাদের চোখের সম্মুখে আমরা দেখিতেছি, রুষদেশের ১৮ কোটী নরনারী ঠিক এইভাবেই তাদের সমাজকে গড়িয়া তুলিয়াছে। আমরা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি, আমরা যদি ছোট-বড় দাবীগুলি মিটাইয়া ক্রমেই স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারি, আমাদের সম্মিলিত শক্তিতে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি, কুটীর সমস্যা মিটাইয়া লইতে পারি, সমাজকে নূতন রূপ দেওয়ার কাজ খুব কঠিন হইবে না। তাই আমাদের সমিতির ভিত্তি খুবই দৃঢ় হওয়া চাই, সমিতির সভ্যদের দৃঢ়সংকল্প হওয়া চাই। কৃষক-সাধারণ এবং কৃষক-কর্মীদের আজ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, এ-সময়ের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, **সংগঠন।** সংগঠনের জন্যই সংগঠন নয়; লক্ষ্য রাখিতে হইবে সংগঠনের ক্ষুদ্র একটী কাজে যেন পরাধীনতার বড় একটী গ্রন্থি খুলিয়া যায়! দ্বিধা, সন্দেহের আজ আর কোন অবকাশ নাই।

কর্মীগণ তাহাদের নিপুণ সংগঠনশক্তি দ্বারা সমিতি গড়িয়া তুলিবে, তাহার ভিত্তি দৃঢ় ও প্রশস্ত করিবে।

বন্ধুগণ, তৃতীয় বছর আপনারা সম্মেলন করিতেছেন। দুই বছরের অভিজ্ঞতা আপনাদের নূতন শিক্ষা দিয়াছে। ভুল, ত্রুটী সম্পর্কেও আপনারা সজাগ হইয়াছেন নিশ্চয়। ভবিষ্যতে আমরা আরো ভাল কাজ দেখাইতে পারিব, আশা করি। আপনাদের ভিতরে কয়টা কথা বলিতে পারিয়াছি। আমি খুবই গৌরবান্বিত।

কৃষকসভার জয় হউক
ইনক্লাব জিন্দাবাদ

১লা, এপ্রিল ১৯৩৯
মালিয়াড়া
বাঁকুড়া

কৃষক ভাইগণ,—

আপনারা জাতির মেরুদণ্ড; ধনদৌলত আপনারাই পয়দা করেন; তাই করেন বলিয়াই দুনিয়াটা চলিতেছে। অথচ আপনাদের দুর্গতির সীমা নাই।

আজ আপনাদের সভায় সভাপতির কাজ করিতে আসিয়াছি। ইহা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। কিন্তু আমার লজ্জাই হইতেছে বেশী। কেননা, আমি যে শ্রেণীর লোক সে শ্রেণী এতদিন আপনাদের নানারকমে শোষণ ও উৎপীড়ন করিয়াছে। আপনাদের উপেক্ষা করিয়া, অবহেলা করিয়াই ভদ্রলোকশ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক, সুতরাং লেখা-পড়া-জানা মানুষ। আপনাদের সম্মুখে আজ স্বীকার করিতে মোটেই লজ্জা নাই যে আমার এই শিক্ষা-দীক্ষার পিছনে রহিয়াছে প্রজা-পীড়ন, কৃষককে শোষণ ও দরিদ্রকে দাবানো, যে-পয়সায় একজন চাষী তার শিশু-সন্তানকে দুধ খাওয়াইতে চাহিয়াছে তাহাই হয়ত বা আমার শিক্ষার খরচের জন্য আসিয়াছে কলিকাতায়। আমরা যে আপনাদের রক্তই শুধু শুষিয়াছি, অথবা আপনাদের মেহনতের ফল লুটিয়া খাইয়াছি তাহা নয়—সমাজের চোখেও আপনাদের হেয় এবং হীন করিয়া রাখিয়াছি। আমার শিশু-কালের একটি কথা আজ মনে পড়িতেছে। আমার বাড়ীর সম্মুখে সরকারী সড়ক। একদিন একটী মুসলমান চাষী খড়ম পায়ে রাস্তা ধরিয়া যাইতেছিল; চাষীর এই স্পর্দ্ধা দেখিয়া আমার অভিভাবক চটিয়া উঠিলেন। লোকটীকে ধরিয়া আনিয়া উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইল। লোকটীর এই অপমান আমার মনে খুবই লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু শিশুবেলা হইতেই অপর আরেকটী মন আমার ভিতরে গজাইয়া উঠিতেছিল। আমার অভিভাবকের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি দেখিয়া খুশীও যে না হইয়াছিলাম তা নয়। আরো

একটী ঘটনা বলি ; একদিন রাত্রিবেলায় আমাদের ঘরের পাশ দিয়া একটী লোক যাইতেছিল। 'কে ?' জিজ্ঞাসা করাতে, সে জবাব দিল, "কর্ত্তা, আমি মানুষ নই—কৈবর্ত্ত।' এত রকমে আমরা মানুষকে অপমান করিয়াছি যে সে ভাবিতেই পারে না,— তারও আবার মানুষ বলিয়া পরিচয় দেওয়ার অধিকার আছে। এ সকল অভিজ্ঞতা লইয়াই আমরা মানুষ হইয়াছি। যে শ্রেণী আপনাদের পশুরও অধম বানাইয়াছে, সমাজে হেয় করিয়াছে, অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে—সেই শ্রেণীর লোক হইয়া আজ যে আপনাদের সভায় আসিয়াছি, তাতে গৌরব ও গর্ব্বের কারণ নাই মোটেই। তবুও আপনাদের নিকট আসি কেন ? দুঃখ-দুর্দশা আপনাদের, দিনের পর দিন আপনারা ইহা সহিয়া আসিতেছেন—কিন্তু কি কারণে আপনাদের এরূপ দুর্গতি তাহা কি বুঝিয়া উঠিতে পারেন ? দশ বছর আগে আপনার যে ধন-সম্পত্তি ছিল, আজ তার বেশী ভাগই খোয়াইয়াছেন। না খাইয়া অথবা রোগযন্ত্রণায় মরিতেছেন, দুর্ভিক্ষের দিনে সন্তান বিক্রয় করিতেছেন অথবা আত্মহত্যা করিয়া চিরতরে সকল জ্বালা মিটাইয়া দিতেছেন, এগুলির কারণ আপনি নির্ণয় করিতে পারেন কি ? জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত বা বলিবেন, কপালের দোষ। আমি যে শ্রেণীর লোক, তারাই জানে কৃষকের এবং চাষীর দুর্দশার কারণ কি ? সারাদিন খাটিয়া একটী চাষী হয়ত বা ছয়টী পয়সা রুজী করিয়াছে ; আমার লোক যদি এখন চাষীর নিকট দাবী করে তিন পয়সা তোমাকে দিতে হইবে—তবে যে আপনি স্ত্রীপুত্র লইয়া না খাইয়া থাকিবেন তার কারণ কি আমার জুলুম নয় ? অজন্মা হইয়াছে, ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। কিন্তু আমার হুকুম হইল—বাকী খাজনা এবং হালসনের খাজনা সবই মিটাইয়া দিতে হইবে। এই জুলুমই কি আপনার সর্ব্বনাশের মূল নয় ? কপাল এবং অদৃষ্টকে দোষ দিয়া আপনারা সন্তুষ্ট এবং নিরস্ত থাকেন ; আপনাদের দুর্দশার

প্রকৃত কারণ সম্পর্কে জ্ঞান আপনাদের নাই। দশজন লোকের জুলুম, জবরদস্তিই যে নব্বই জন লোকের অভাব-অভিযোগের কারণ,—এই সহজ সরল কথাটা বুঝাইবার যোগ্যতা আমাদের মত লোকের আছে। কেননা, এই দশজন লোকের ভিতরেই আমাদের স্থান ছিল, শোষক সম্প্রদায়ের ভিতরই আমরা জন্মিয়াছি। সুতরাং আসল কারণ আপনারা না জানিলেও, আমাদের অজ্ঞাত নয়।

ভদ্রলোকশ্রেণী আপনাদের শোষণ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তারাই একমাত্র শোষক নয়। ভদ্রলোকেরা আপনাদের নিকট জমিদার, তালুকদার, জোতদার—এইরূপ নানা নামে পরিচিত; এদের উপরে একদল লোক আছে, তাদেরই দালালের মত কাজ করে আমাদের ভূমির মালিকেরা। এরাই ভদ্রলোকশ্রেণীকে শোষণের কাজে নিয়োগ করিয়াছে। একদল লোক বিদেশ হইতে আসে আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য। ইতিহাস বলিবে লেন-দেন দ্বারাই শুধু ইহারা কাজ-কারবার চালাইত না,—জুলুম, জবরদস্তি,—ঐগুলিও তাদের রোজগারের উপায় ছিল। আমাদের দেশ দখল করিয়া প্রজার নিকট হইতে যথেচ্ছ কর এবং খাজনা আদায়ে ইহারা মনোযোগী হইল। কি সাংঘাতিক ছিল এদের টাকার লোভ,—একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আপনারা বুঝিবেন। বাংলাদেশে একবার খুব দুর্ভিক্ষ হইল। এতবড় দুর্ভিক্ষ নাকি আর কখনো হয় নাই। তিনভাগের একভাগ লোকই দুর্ভিক্ষে মারা গেল। কিন্তু এই দুঃসময়েও খাজনার হার আগের চেয়ে বাড়িয়া যায়। এই জুলুমের সহায়তার জন্যই একদল দেশী লোকের আবশ্যক হইল। ইহারাই জমিদার-তালুকদার। আপনাদের পূর্বপুরুষেরাই ছিল আগে জমির মালিক। কিন্তু হঠাৎ একদিন কৃষকের স্বত্ব বিলোপ করিয়া দেওয়া হইল; আর ঘোষণা করা হইল আজ হইতে জমির মালিক যে-চাষ করে সে নয়, যে-তহশীল করে অর্থাৎ খাজনা আদায় করে যে সে-ই। রাতারাতি এইপরিবর্তন

হইল; যার স্বত্ব ছিল না তাকে দেওয়া হইল স্বত্ব। যার স্বত্ব ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করা হইল না, তার সম্মতি লওয়া হইল না, তাকে কোনপ্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা উঠিল না। পাকাপাকি বন্দোবস্ত হইয়া গেল,—জমির মালিক জমিদার। কৃষকের এখন স্থায়ী স্বত্ব যখন কিছু নাই, যে-কোন সময়ে জমিদার তাকে উচ্ছেদ করিতে পারে। গ্রামের যে সকল সম্পত্তি ছিল সকলের অধিকারের বস্তু, আজ তাহা হইয়া দাঁড়াইল একজন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আজ কি জঙ্গলে কাঠ কুঁড়াইবার অধিকার আপনার আছে? আজ কি নদীতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিবার অধিকার আপনার আছে? পূর্বে জঙ্গল, পুকুর, গোচারণভূমি, নদী এগুলিতে ছিল সকলের সমান অধিকার। যে-দিন হইতে কৃষকের অধিকার লোপ করিয়া জমিদারের স্বত্ব সৃষ্টি করা হইল, সেদিন হইতেই সুরু হইয়াছে সকল অনাসৃষ্টি।

আগে, ফসল উৎপাদন করিয়া খাওয়া-পরার পরে যে অংশটা কৃষকের অতিরিক্ত থাকিত, তাহা হইতেই দেওয়া হইত রাজসরকারের খাজনা। কিন্তু যেদিন হইতে কৃষকের স্বত্ব লোপ করা হইল, সেদিন হইতে এই রীতিও বদলাইয়া গেল। অতিরিক্ত অংশ যদি কিছু থাকে তার ত কথাই নাই—গ্রাসাচ্ছাদনের মোটা অংশটাও খাজনার ভিতরে পড়িবে। শুধু খাজনাই নয়, আরো কতরকমের উপরি-পাওনা কৃষককে দিতে হয়। আপনার বাড়ীতে বিয়ে, সুতরাং জমিদারকে দিতে হইবে। আপনার ঘরে সন্তান জন্মিয়াছে, সুতরাং মনিবকে খুসী করিতে হইবে। জমিদারের কাছারী ঘরে বাতি জ্বলে, সুতরাং প্রজাকে তার খরচ না দিয়া উপায় নাই। প্রতি পদে পদে জমিদারের খেয়ালকে চরিতার্থ না করিয়া আপনি চলিতে পারেন না। জমিদারের এই খেয়ালের দাম বিশ কোটী হইতে ত্রিশ কোটী টাকা, আর খাজনার পরিমাণ পনর, ষোল কোটী টাকা। আমরা সেদিন একটা হিসাব লইয়াছিলাম।

তাতে দেখা গিয়াছে,—এ কয়বছরে ফসলের দাম গড়পড়তা অন্তত শতকরা চল্লিশ টাকা কমিয়া গিয়াছে; অথচ জমিদারের খাজনা বাড়িয়াছে শতকরা তের টাকা।

আপনাদের অবস্থাটা আপনারা এবার ভাল করিয়া বুঝিয়া লউন। গত কয়বছরে অর্ধেকের বেশী ফসলের দাম কমিয়াছে। কিন্তু তবুও জমিদারের খাজনার নিরীখ বাড়িয়া গিয়াছে। আপনাদের এ-অঞ্চলে বিঘা প্রতি পাঁচ টাকার উপরে খাজনার হার। এখন একটু হিসাব করিয়া দেখুন একবিঘা জমির ফসল বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পান, খাজনা তার কত অংশ। ফসলের দাম কমিয়া গিয়াছে, সেই পরিমাণে মহাজনের ঋণও হ্রাস পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ সকল কিছু হয় নাই বলিয়াই চাষের জমি, অথবা রায়তী-জোত আজ আপনাদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। জমিদার জমি খাস করিয়া লইয়াছে, অথবা আপনারা জমি ইস্তাফা দিয়াছেন। মহাজনের হাতেও যথেষ্ট জমি গিয়াছে। কিন্তু এরা জমি লইয়া করিবে কি? যে জমি পূর্বে আপনাদের দখলে ছিল, এখন হইতে সেই জমিতেই আপনারা ভাগচাষীর কাজ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, কৃষক ছিল জমির মালিক; কিন্তু রাতারাতি এক কলমের খোঁচায় তার স্বত্ব বিলোপ হইল। মালিকানা-স্বত্ব হারাইয়া চাষী জমির উপর কিছু কিছু দখলী-স্বত্ব পাইয়াছিল; কিন্তু জমিদার-মহাজনের অত্যাচারে গত কয়বছরে তা'ও সে হারাইল।

এখন আপনাদের জিলার একটু পরিচয় উপস্থিত করিব; তাহা হইতে আপনাদের নিজেদের পরিচয় আপনারা পাইবেন। এ জেলায় দশলক্ষ লোক; তিনলক্ষ লোক উপার্জন করে; বাকী সাতলক্ষ তাদের পোষ্য। শতকরা সত্তর জন লোকের জীবিকানির্বাহ হয় জমি হইতেই। জেলার আয়তন ১১ লক্ষ একর; তার ভিতর পৌনে দুইলক্ষ একর চাষের অযোগ্য; আট লক্ষ একর প্রকৃত পক্ষে চাষ হইতেছে। সোয়া লক্ষ

একর জমি এখনো অনাবাদী রহিয়াছে, অথচ তাহা চাষের যোগ্য। শতকরা ৬৭ জন চাষীর হাতে রহিয়াছে এক একর এবং তার কম জমি। শতকরা ১৫ জনের জমি ১ হইতে ২ একরের মধ্যে; শতকরা ৭ জনের ২ হইতে ৩ একর জমি। শতকরা ৪ জনের জমির পরিমাণ ৩ হইতে ৪ একর। হাজার কৃষকের ভিতরে একজন হয়ত বা ২৫ বিঘা জমির মালিক। তারপর আপনাদের ঋণের কথা: ৪২৬টী কৃষক-পরিবারের ভিতরে ২৩৪টী পরিবারই ঋণগ্রস্ত; অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬০টী পরিবারই মহাজনের নিকট আটকা। প্রত্যেকটী ঋণগ্রস্ত কৃষক-পরিবারের গড়-পড়তা ঋণের পরিমাণ ২৩০৲ টাকা। কোন একজন কৃষকের মোট ঋণের পরিমাণ ৫৪৲ টাকা হইলে, তার ভিতর ৩২৲ টাকার পিছনে রহিয়াছে জমি বন্ধক। ১৯২৩ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত আপনাদের জিলার জমি, বন্ধকের পরিমাণ হইয়াছে ২, ০৭, ০৮ ৪৩০৲ টাকা। একটা হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে মহাজনের ১১ হাজার টাকা এ-জেলায় খাটে শতকরা ১৫০৲ টাকা হার সুদে।

ইহাই হইল মোটামুটি আপনাদের আর্থিক অবস্থার চিত্র। আপনার মহাজনের নিকট আটকা, জমিদারের নিকট বাঁধা, রোগগ্রস্ত, অশিক্ষিত। তার উপরে সরকারের পাওনা রহিয়াছে; টেক্স বাবত আপনারা বাৎসরিক অন্তত প্রতিজনে ছয়টী করিয়া টাকা দিতেছেন। অথচ শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, আপনাদের বাৎসরিক আয় মাত্র গড়পড়তা প্রতিজনে ১২৲ হইতে ১৫৲ টাকা। প্রথম শুনিলে হয়ত বা বিশ্বাস হইবে না; কিন্তু আমরা কি জানিনা, কৃষকের ঘরে ছয়মাস খোরাক থাকে না বলিলেই চলে? ফাল্গুন-চৈত্র হইতে সুরু করিয়া আষাঢ়-শ্রাবণ পর্যন্ত চাষীর ঘরে যে হাহাকার সৃষ্টি হয় প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া কাহারো পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে। অথচ চাষীর এই অবস্থাটাই কতিপয় লোকের মস্ত সুযোগ। পাঁচ সের ধান কর্জ দিয়া

নূতন ফসল উঠানের সময় হয়ত বা দেড়গুণ পরিমাণ ধান আদায় করিয়া লইবে। এই সময়টির জন্যই বড়লোকেরা গোলায় ধান মজুত করিয়া রাখে। জমিতে চাষীর স্বত্ব বিলোপ হইবার পূর্বে গ্রামে ধর্মগোলা থাকিত; দুঃসময়ে চাষী ধর্মগোলার সাহায্য পাইত। আজ জমিদার-মহাজনদের গোলায় ধান মজুত করা হয় চাষীকে শুষিবার জন্য, সাহায্য ত দূরের কথা।

আপনাদের জিলায় জমি নাই এমন লোকের সংখ্যাই বেশী। জমিহীনদের জমি চাষ করিবার রীতিকে এ-জেলায় বলা হয় কৃষাণী, খাইদ অথবা বাড়িখাওয়া, ভাগচাষ, কুত-চাষ ইত্যাদি। কৃষাণী প্রথায় চাষীকে ঘরের চাকর বলিলেই চলে। জমিদার গরু, লাঙ্গল দিবে, কিন্তু সারের এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের কিছুটা চাষীকেই বহন করিতে হইবে। ফসল তুলিতে হইবে জমিদারের খাস-খামারে; তিন ভাগের একভাগ মাত্র কৃষাণ সেখান হইতে লইবে। চাষের সময়ে কৃষাণ জমিদারের নিকট হইতে ভরণ-পোষণের জন্য মাঝে মাঝে খাইদ্ (টাকা) অথবা ধান (বাড়ী) লইতে পারে। জমিদার ফসল উঠিলে পর শতকরা পঞ্চাশ অথবা পঁচিশ হারে কৃষাণের ভাগ হইতে সুদ আদায় করিয়া লইবে। অমনিই'ত কৃষাণ মাত্র একতৃতীয়াংশ পাইবে, তার উপর যদি আরো সুদ দিতে হয় তবে তার থাকে কি? সুতরাং পরের বছরও তার খাইদ্ অথবা ধান না লইয়া উপায় থাকে না। এইভাবে জমিদারী এবং মহাজনী-প্রথা একটী পাপচক্র সৃষ্টি করিয়া চাষীকে পিষিয়া মারিতেছে।

এখন প্রশ্ন উঠিবে প্রতিকারের পথ কি, নিষ্কৃতি কোন্ পথে? আপনাদের এ অঞ্চলে যখন প্রথম রেল-রাস্তা তৈয়ারী হয়, তখন একদল হিন্দুস্থানী মহাজন এখানে আসে। সরল-বুদ্ধি সাঁওতালীদের টাকা কর্জ দিয়া জালিয়াতী, জুয়াচুরীর সাহায্যে এরা তাদের সর্বস্ব লুটিয়া

লইত। সাঁওতালীরা এ অত্যাচার রুখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল; রাজপুরুষের বলিয়া যখন কিছু হইল না তখন তারা একতাবদ্ধ হইয়া বিদ্রোহ করে। এত ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ হইয়াছিল যে পূর্বদেশে ইংরাজের সমস্ত ফৌজ আপনাদের এবং পার্শ্ববর্ত্তী জিলাগুলিতে আনিতে হইয়াছিল। এ'ত আপনাদের ঘরের ইতিহাস। আপনারা যদি সকলে মিলিয়া ঐক্যবদ্ধ হন, কার শক্তি আছে আপনাদের প্রবল শক্তিকে বাধা দেয়। একদিকে আপনারা সংখ্যায় শতকরা নব্বই জন; তার উপরে মূল জিনিস পয়দা করেন আপনারাই? এই সত্যটী আপনাদের ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে; যেদিন আপনারা বুঝিবেন, সেদিন আপনাদের মনিব এবং মালিকেরাও বুঝিবে তারা কত অসহায়। ভারতবর্ষের এবং বাংলার সর্বত্র কৃষকেরা তাদের সমিতি গড়িয়া তুলিতেছে; সংঘবদ্ধভাবে কাজের জন্য তারা আয়োজন করিতেছে। আপনাদের পাশের জেলায় দামোদর অঞ্চলে কৃষকেরা কি অদ্ভুত বীরত্ব এবং অসম সাহসের পরিচয় দিতেছে, সে সংবাদ আপনাদের নিকট নিশ্চয় পৌছিয়াছে। সেখানে কৃষকেরা লড়াই করিতেছে জমিদারের বিরুদ্ধে নয়, খোদ সরকারের বিরুদ্ধে। একই কথা, পূর্বেই বলিয়াছি সরকার ও জমিদার দুয়েরই কাজ প্রজার নিকট হইতে বেশী আদায়। দামোদরের জলে প্রজার জমির কাজ কিছু হউক না হউক, উচ্চহারে খাজনা তাকে দিতেই হইবে। সরকারের লোকেরা আসিয়া গরু ক্রোক করিয়া লইতেছে, কিন্তু কৃষকেরা এত সংঘবদ্ধ যে নীলাম ডাকিয়া লইবার লোক পাওয়া যাইতেছে না। সেখানে কৃষকের আন্দোলনে আপনারা নিশ্চয়ই আনন্দ প্রকাশ করিবেন। কিন্তু আরো বড় বড় লড়াই আপনাকে করিতে হইবে; তার জন্য বিনা-বিলম্বে আপনাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। আমাদের দেশে কতকগুলি দেশীয় রাজা আছে; এরা আপনাদের জমিদারের চেয়ে আরো অত্যাচারী। ভারতবর্ষের

আটকোটী লোক এদের অধীনে বাস করে। সেখানে প্রতি পদে পদে অপমান, অত্যাচার; উঠিতে বসিতে টেক্স। একটা দেশীয় রাজ্যের কথা শুনিয়াছি; গরু রাখিবার জন্য যেমন খোঁয়াড় আছে, তেমনি মানুষ রাখিবার জন্যও খোঁয়াড় আছে। সেখানকার লোকেরা আজ চূড়ান্ত ভাবে এসকলের নিষ্পত্তি করিবার জন্য লড়াই করিতেছে। এরা আপনাদেরই মত কৃষক—নিজের জমিতে অথবা পরের জমিতে চাষ করিয়া জীবনোপায় করে। আজ তারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে, এসংবাদে কি আপনাদের উৎসাহ হয় না? কিন্তু কোন কাজ হইবে না, শীঘ্র যদি আপনারা সমিতি গঠন করিয়া তার সভ্য না হন এবং সমিতির অধীনে সৈনিকের মত কাজ না করেন।

সমিতি আপনাদের শিখাইবে এবং সমিতির মারফত আপনারা দাবী জানাইবেন, জমিদারের স্বত্ব বিলোপ করিয়া আমাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা কর; পূর্বে'ত কৃষকই ছিল জমির মালিক। আপনাদের অপর দাবী হইবে মহাজনী প্রথার উচ্ছেদ; সরকারের তহবিলে সবই'ত আপনাদের টাকা। রাজপুরুষদের মোটা মোটা বেতন কমাইয়া যে টাকা বাঁচিবে তাহা হইতে অল্পসুদে কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা হইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে এ জেলায় ১ লক্ষ একরের উপরে জমি এখনও অনাবাদী রহিয়াছে; অথচ তাহা চাষের যোগ্য। সরকার টাকা খরচ করিয়া এই জমিতে যদি চাষের ব্যবস্থা করে, তবে আপনাদের মধ্যে কেহ বেকার থাকিতে পারেন না। আপনাদের একটী শ্রেষ্ঠ দাবী হইবে খাজনা অন্তত অর্ধেক কমাইয়া দেওয়া এবং প্রধান প্রধান ফসলের দাম বাঁধিয়া দেওয়া। যারা কৃষি-মজুর তাদের মজুরীর হার নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। আপনাদের এ জেলায় ঝড়িগ্রামে দিনমজুরেরা একত্র হইয়া উচ্চহারের মজুরীর জন্য লড়িয়াছিল; কিছুটা যে তারা সফলকাম না হইয়াছিল এমন নয়। দৈনন্দিন জীবনে যত রকমের অত্যাচার

আপনাদের সম্মুখে আসে, সকলগুলির অবসানই হইবে আপনাদরে লড়াইয়ের বিষয়। সরকার আপনাদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটী অনুসন্ধান কমিটি বসাইয়াছে। জমিদাররা সাক্ষ্য দিতেছে এবং রিপোর্ট দাখিল করিতেছে—আপনারা ত বেশ সুখেই আছেন; পিতা যেমন পুত্রের সঙ্গে আচরণ করে জমিদারেরাও নাকি আপনাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করে। তদন্ত কমিটি আপনাদের নিকট আসিলে অবশ্যই আপনারা প্রতিপন্ন করিবেন জমিদারেরা যাহা বলে তাহা মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা, কিন্তু সকল কিছুই সম্ভব যদি আপনারা সংঘবদ্ধ ভাবে সমিতির অধীনে দাঁড়াইতে পারেন।

আজ লড়াইয়ের জন্য আপনাদের সমিতির প্রয়োজন; কিন্তু অপনারা জয়লাভ করিলে পরও সমিতি আপনাদের কল্যাণের কাজে লাগিবে। সমিতি প্রত্যেকের তত্ত্বাবধান করিবে, রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইবে, জমি বিলি-বন্দোবস্ত করিবে, শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করিবে। এইভাবে যখন কাজ চলিবে তখনই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, দশজন মিলিয়া কাজ করি বলিয়াই, আমি প্রকৃতপক্ষে আমার প্রভু হইতে পারিয়াছি। দশজনের প্রত্যেকটী কাজের ভিতরে আপনার হাতের ছাপ পড়িবে। এখন আপনাদের উপযুক্ত অন্ন নাই, উপযুক্ত বাসস্থান নাই, উপযুক্ত শিক্ষা নাই। ইহার একমাত্র কারণ কয়েকজন লোকদ্বারা বেশীর ভাগ লোকের শোষণ। দশগ্রাম মিলিয়া যখন সমিতির অধীনে থাকিব, তখন কে কাকে শোষণ করিবে? অন্নের অভাব এবং শিক্ষার অতৃপ্তি তখন মিটিবে। এমনি একটী দেশ কৃষকেরা মজুরদের সাথে মিলিয়া আমাদের ভারতবর্ষের উত্তরে গড়িয়া তুলিয়াছে। এ-দেশের নাম কৃষ-মুল্লুক। সেখানে রাজা নাই, জমিদার নাই; কৃষককে উৎপীড়ন করিবার জন্য এবং সায়েস্তা করিবার জন্য পুলিস-পল্টন নাই। কৃষক আর মজুর,—অর্থাৎ যারা উৎপাদন করে, পয়দা করে তারাই তাদের রাজা।

তাদের নিজেদের সমিতির মধ্য দিয়া তারা নিজেদের দৈনন্দিন কাজ কারবার চালায়। আপনারা চীনদেশের নাম শুনিয়াছেন। সেখানে আপনাদেরই মত যারা উৎপীড়িত তারা সংঘবদ্ধ হইয়া মুক্তির লড়াই চালাইতেছে।

নানা দেশের সাধারণ লোকের লড়াইয়ের কথা আপনারা শুনিয়াছেন; আপনারাও কোন কোন জায়গায় ছোট ছোট লড়াই হয়ত-বা করিয়াছেন। কিন্তু বৃহৎ-আকারে যুদ্ধ আপনাদের শীঘ্রই করিতে হইবে।

আপনারা জমিদার-মহাজনকে ভালভাবেই চিনেন। তাদের বিরুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে হইলে সকল সময়ই আপনাদের লড়িতে হয়। কিন্তু তাহাতে ত দুঃখ-কষ্টের চরম নিষ্পত্তি হইবে না। জমিদার-মহাজন যাদের হাতে পুতুল তার শেষ না হইলে আপনাদের চরম শান্তি আসিতে পারে না।

আপনারা সংঘবদ্ধ হউন, সমিতি গঠন করুন, ভারতের এবং ভারতের বাহিরের কৃষক-মজুর এবং জনসাধারণের সহিত আপনারা যে একই সূতায় গাঁথা—এই বোধ আপনাদের জন্মুক।

আপনাদের লড়াই জয়যুক্ত হউক!
ইনক্লাব জিন্দাবাদ !!

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯
বীরভূম

আবদুল হালিম
(মুর্শিদাবাদ)

[চার]

কৃষক বন্ধুগণ!

আপনারা আমার মত একজন অ-কৃষককে আপনাদের জেলার কৃষক-সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আমার প্রতি যে গভীর ভালবাসার পরিচয় দিয়াছেন তাহার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি নিজে কৃষক না হইলেও কৃষক-পরিবারেই আমার জন্ম এবং গত ১৫।১৬ বছর শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকায়, আমি কৃষকদের ঘরের খবর ও মনের পরিচয় রাখি। কিরূপ নিদারুণ দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া আমার গরীব কৃষক-ভাইদের দিন কাটাইতে হয়, তাহা আমি ভালভাবে জানি। কাজেই আপনাদের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আপনাদের এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি। জানিনা আমি আপনাদের মনের কথা কতদূর বলিতে সমর্থ হইব।

আমারও জন্ম পল্লীগ্রামে। আপনাদেরই পার্শ্ববর্ত্তী জেলা বীরভূমে আমার জন্মস্থান। বীরভূম জেলার কুয়ে ও ময়ূরাক্ষী নদীর পর পার হইতেই আপনাদের জেলার সীমানা সুরু হইয়াছে; কাজেই উভয় জেলার কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু খবর জানা আছে। আজ আপনাদের জেলার কৃষকদের যে অবস্থা তাহা বাংলার অন্যান্য জেলার কৃষকদের অবস্থা হইতে আলাদা বা পৃথক নয়।

আজ এখানে সভাপতিত্ব করিতে আসিয়া আমার সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়িতেছে আমাদের পরাধীনতার কথা, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নির্ম্মম-শোষণে আমাদের চরম দুরবস্থার কথা। মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে আমাদের পরাধীনতার অভিশপ্ত হীন জীবন বিশেষভাবে জড়িত। এই জেলার অতীত কাহিনী অনেক কথাই মনে করাইয়া দেয়। ইতিহাসের

সঙ্গে এই মুর্শিদাবাদ জেলার অনেক অতীত স্মৃতি, সুখ-দুঃখের কাহিনী বিজড়িত। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত করিয়া এখানেই বিদেশী ইংরেজ বণিকগণ ভারতের অধিবাসীদের পায়ে পরাধীনতার কঠিন শিকল পরাইয়া দেয়। তখন হইতে আজ দুই শত বছরের মধ্যে বিদেশী-সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ফলে আমাদের দেশের কৃষকদের যে চরম শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা ভাবিতেও বুক শিহরিয়া উঠে! বিদেশী শোষণ, লুণ্ঠন ও জুলুমের কাহিনী নূতন করিয়া বলার বোধ হয় আবশ্যক নাই। ইংরেজ রাজত্বে ভারতের যে দুর্গতি হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বের তুলনায় বিভিন্ন প্রকৃতির নয়—বহুগুণে তীক্ষ্ণ ও তীব্রও বটে। ভারতবর্ষের গ্রাম্য-জীবন ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে এক রকমের ছিল,—কিন্তু ইংরেজ আসার সঙ্গে সঙ্গে সে জীবনের ভিত্তি-ভূমি একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ইংরেজ আমলে ভারতীয় সমাজের আসল কাঠামো একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে—এখনো তাহা নূতন করিয়া গড়িয়া উঠার কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। ভারতবর্ষ তাহার প্রাচীন জীবন হারাইয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু আজও নূতন জীবনের সন্ধান পায় নাই। ধনতান্ত্রিক শোষণ পাষাণের মত আমাদের বুকে চাপিয়া আছে ও আমাদের কৃষক শ্রেণীকে পিষিয়া মারিতেছে। ইংরেজ শাসনে ভারতভূমি তাহার অতীত সমাজ-জীবন ও কীর্ত্তি, সব হারাইয়াছে, তাহার অতীতের সংস্রব ছিন্ন হইয়াছে। আজ কৃষকদের জীবনে বিষাদের ঘনছায়া, তাহার মনে অবসাদ, শোষণের চাপে সে মৃতপ্রায়, আজ কৃষক ধনিক শ্রেণীর অত্যাচারে মাথা তুলিতে পারিতেছে না। বাংলার সমস্ত জেলার কৃষকদের এই একই অবস্থা।

ভারতবর্ষে সাতলক্ষ গ্রাম আছে। আর আমাদের এই বাংলা দেশে গ্রামের সংখ্যা ৮৬ হাজার। এই সব গ্রামের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই দরিদ্র কৃষক বা জমির দিন-মজুর। চাষীরা সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটিয়া,

রোদ বৃষ্টিতে ভিজিয়া জমিতে ফসল ফলায়, কিন্তু তবুও তাহারা তু'বেলা পেট পূরিয়া খাইতে পায় না, তাহারা ক্ষেতে যে ফসল পয়দা করে সেই ফসলের মালিক তাহারা নয়। কৃষকগণ যে জমি চাষ করে তাহার মালিক জমিদার। জমির ফসলের সবটুকুই জমিদার, মহাজন ও সরকারের খরচ যুগাইতে চলিয়া যায়। আর কৃষক ভাইগণ কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অনাহারে জীবন যাপন করে।

মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থা

আমি এখন আপনাদের জেলার একটু পরিচয় উপস্থিত করিব। তাহা হইতে আপনারা আপনাদের অবস্থার সামান্য পরিচয় পাইবেন।

বর্ত্তমানে এই জেলার লোক সংখ্যা তের লক্ষ সত্তর হাজারেরও উপরে। ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯ শত বারো জন লোক কোন-না-কোন কাজে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জন করে। আড়াই লক্ষের কিছু বেশী লোকের জীবিকা সাধারণ কৃষি-কর্ম্ম, চাষ-আবাদের উপর নির্ভর করে। চাষ করে না এমন জমির মালিকের সংখ্যা ১৩ হাজার। নিজ হাতে জমি চাষ করে এইরূপ জমির মালিকের সংখ্যা এক লক্ষ বারো হাজার। বর্গা ও কুর্ফা চাষীর সংখ্যা ১২ হাজার। কৃষি-মজুরের সংখ্যা অর্থাৎ যাহারা জমিতে খাটিয়া খায় তাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ ১৮ হাজারেরও উপরে। এই তো গেল জেলার লোক সংখ্যার হিসাব। লোকসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগই কৃষক-চাষী। এই চাষীদের বাদ দিলে দেশের কিছুই থাকে না। অথচ চাষীদের দুঃখকষ্টের শেষ নাই। আপনারা সারাদিন গতর খাটান, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, শরীরের রক্ত জল করিয়া, দিন-মজুরি করিয়া, হাড় ভাঙ্গা খাটিয়াও আপনার স্ত্রী পুত্র পরিজনের মুখে দুই মুঠি ভাত তুলিয়া দিতে পারেন না। এই ভাবে যদি আপনারা মরিতে থাকেন তাহা হইলে আপনাদের বাঁচাইবে কে?

ধনী, জমিদার, সুদখোর আপনাদের বাঁচাইবে না,—আপনাদের বাঁচিবার পথ আপনাদেরই করিতে হইবে। কৃষককেই তাহাদের এই ভীষণ দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য সম্মুখে আগাইয়া আসিতে হইবে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর, কান্দী, লালবাগ ও জঙ্গীপুর এই চারটী মহকুমা আছে। এই মহকুমার মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন থানা ও ইউনিয়ন বোর্ড আছে। বহরমপুরের ৬টী থানায় ৫০টী ইউনিয়ন বোর্ড আছে, কান্দীতে ৪টী থানায় ৩৭টী ইউনিয়ন বোর্ড, জঙ্গীপুরের ৪টী থানায় ৩৪টী ইউনিয়ন বোর্ড, আর লালবাগে ৬টী থানায় ৩৭টী ইউনিয়ন বোর্ড আছে। আপনাদের জেলার কৃষকদের সকলেই ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন বাস করেন ও ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দেন, আর জমিদারকে খাজনা যোগান। যে পয়সা খরচ করিয়া আপনারা চাষ করেন তাহাতে আজকালকার মন্দার বাজারে আপনাদের খরচই উঠেনা। তারপর জমির খাজনা, ট্যাক্স, রোগের ঔষধপত্র, আরো নানান রকম ঝঞ্ঝাট লাগিয়াই আছে। আয় হইতে আপনাদের খরচ সংকুলান হয় না, সুতরাং বাধ্য হইয়া দেনা করিতে হয়। দেনার দায়ে আপনাদের মাথাটা পর্য্যন্ত বিক্রী হইয়া আছে, ঋণের দায়ে জমি আপনাদের হাত হইতে জমিদার, মহাজনের হাতে চলিয়া যাইতেছে। কৃষক ভাইদের খাওয়া-পরার কোন উপায় নাই,—দিন-মজুরীও জুটিতেছে না। এই ভাবে চাষী সর্বস্ব হারাইতে বসিয়াছে। এখন যদি চাষী তাহার নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা না করে তাহা হইলে তাহার বাঁচিবার আর অন্য কোন উপায় নাই।

মুর্শিদাবাদ জেলার বাগড়ী অঞ্চলে প্রত্যেক বছরই বান হয়। একটা বিরাট অংশ বানের জলে ডুবিয়া যায়। হিজলের বান, পদ্মা ও ভৈরবের বান, গঙ্গা ও ময়ূরাক্ষীর বানে চাষীর সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যায়। জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে ইহার অনেকটা প্রতিকার করিতে পারেন। কিন্তু তাহারা এবিষয়ে কিছু করা প্রয়োজন বোধ করেন না। এই বছর

আপনাদের জেলায় বন্যা হওয়ায় কৃষকদের ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে। বন্যার জলে সব ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কৃষকের ঘরে ভাত নাই। কৃষকদের অভাব মোচন কল্পে গভর্ণমেণ্ট কোনই সাহায্যের ব্যবস্থা করেন নাই—যে সাহায্য বা ঋণ গভর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে দেওয়া হইয়াছে তাহা নগণ্য। জনসাধারণের তরফ হইতে অবশ্য কিছু রিলিফ দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু এই বিরাট জেলার হাজার হাজার কৃষকের পক্ষে কোনো মতেই তাহা যথেষ্ট হইতে পারে না। ইহা হইতে আপনারা গভর্ণমেণ্ট, জমিদার মহাজনের স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। তারপর অনাবৃষ্টি, জলের অভাব ও অন্যান্য অনেক বিপদ আপনাদের মাথার উপর চাপিয়া আছে। যদি বা কিছু ধান, পাট, ইক্ষু হয়, যদিও বা কিছু চৈতালী ধান হয় তাহারও দর নাই বাজারে। যদিও বা একটা বাঁধাধরা দর থাকিত তাহা হইলেও কৃষকের হাতে দুই পয়সা আসিতে পারিত। কিন্তু তাহারও উপায় নাই। জমিদার মহাজন, ফড়িয়া ও দালালের উপর চাষীদের নির্ভর করিতে হয়। চাষী প্রাণ দিয়া, দেহের খুন দিয়া শস্য, ফসল পয়দা করে, অথচ তাহার ইহাতে কোন পাওনা-গণ্ডা নাই, তাহাকে বেশীরভাগ সময় অনাহারে কাটাইতে হয়। ইহার জন্য দায়ী কে? ইহার প্রকৃত কারণ আপনাদের অজানা নাই। আজ গ্রামের প্রত্যেক চাষীকে জানিতে হইবে কি ভাবে এই অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে। ইহাই হইতেছে আপনাদের জেলার অবস্থার মোটামুটি চিত্র। আপনারা মহাজনের নিকট আটকা, জমিদারের নিকট বাঁধা, রোগগ্রস্ত, অশিক্ষিত। তাহার উপরে সরকারের পাওনা রহিয়াছে; ট্যাক্স বাবত আপনারা বছরে অনেক পয়সা দিয়া থাকেন। শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে আপনাদের বাৎসরিক আয় গড়পড়তা ১৪।১৫ টাকার বেশী হইবে না। আপনাদের ঘরে ছয়মাসের বেশী খোরাক থাকে না। ফাল্গুন-চৈত্র হইতেই আপনাদের খাদ্যের অনটন পড়ে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে চাষীর ঘরে যে হাহাকার

সৃষ্টি হয় তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া কাহারও পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু আপনাদের এই অবর্ণনীয় দুরবস্থার প্রতিকারের উপায় কি ?

আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মুর্শিদাবাদের কৃষকদের অবস্থা বাংলার অপর জেলাগুলির কৃষকদের অবস্থা হইতে ভিন্ন নয়। আমি এখন সমগ্রভাবে বাংলার কৃষকদের অবস্থা ও তাহার দুর্দ্দশার প্রতিকারের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কৃষকের অবস্থা

আমাদের দেশের চাষীদের অবস্থা যে কত বেশী খারাপ হইয়া পড়িয়াছে এবং দিন দিন খারাপের দিকে যাইতেছে তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের দেশ আজ প্রায় দুই শত বছর ইংরেজের অধীনে রহিয়াছে, কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে প্রত্যেক ইংরেজেই আমাদের প্রভু বা মনিব। আমাদের প্রকৃত মনিব হইতেছে ইংরেজ ধনিক, বনিক, কলের ও ব্যাঙ্কের মালিকগণ। দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতাও এই শ্রেণীর হাতেই আছে। ইহারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়া এদেশে ব্যবসায় বাণিজ্য ও কারবার ফাঁদিয়া বসিয়াছে। তাহারা রেল, ডক, জাহাজ, খনি ও মিলের মালিক। ইহারা ভারবর্ষের কৃষিজাত কাঁচামাল বিদেশে চালান দিয়া কোটী টাকা মুনাফা করিয়া থাকেন। তাহারা আমাদের দেশ শাসন করেন এবং শোষণের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা আমাদের শাসন করেন। আমাদের দেশের কৃষকগণ রাতদিন পরিশ্রম করিয়া যে কাঁচামাল পয়দা করেন, তাহা সস্তাদরে কিনিয়া ইংরেজ প্রভুরা নিজের দেশে চালান দেন। ব্যবসায়-কারবার ও বাজারের একচেটীয়া অধিকার এই প্রভুদের হাতেই রহিয়াছে। বাজারের দাম উঠা-নামার চাবিকাঠি তাদের হাতেই রহিয়াছে। কাজেই আমাদের কৃষকগণ তাহাদের উৎপন্ন ফসলের পূরা দাম পান না।

তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে উক্ত বিদেশী বনিকগণ। এমন কি বেশীর ভাগ জায়গায় কৃষকগণ যে দামে তাহাদের মাল বেচিতে বাধ্য হয়, তাহাতে তাহাদের মেহানতের খরচও পোষায় না।

আমাদের দেশের কৃষকদের নিকট হইতে যে কাঁচামাল কিনিয়া লইয়া বিদেশে রপ্তানী করা হয় তাহাই আবার কারখানায় পাকামালে রূপান্তরিত করিয়া পুনরায় বিদেশী ব্যবসায়িগণ এদেশে আমদানী করেন ও আমাদের নিকট চড়া দরে বিক্রয় করেন।

বেচা-কেনার ব্যাপারে আমাদের দেশীয় অনেক ব্যাপারী, দালাল, ফড়িয়া, আড়ৎদার, দোকানদারগণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারাও আমাদের কৃষকদের কম শোষণ করে না। ইহার উপরে আবার সাম্রাজ্যবাদী আইন-আদালত রহিয়াছে; সেখানেও কৃষকগণ উকীল, ব্যারিষ্টার, মোখ্‌তার, আমলা, কর্ম্মচারী, থানাদার প্রভৃতির দ্বারা কম শোষিত হয় না। ইহার উপরেও জমিদারের শোষণ আছে। জমিদারের কর্ম্মচারীদের শোষণ আছে, গ্রাম্য মহাজন, সুদখোরদের শোষণ আছে। সুদখোররাই কৃষকদের সবচেয়ে বেশী শোষণ করে এবং তাহারা কৃষকদের বেশী কষ্ট দিয়া থাকে। অনেকস্থলে সুদখোর ও জমিদার একই লোক। ইহাদের শোষণের ফলে লাখ লাখ কৃষকের জমি হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে ও রোজ রোজ হাতছাড়া হইতেছে। ইহাদের অত্যাচারে কৃষক সর্বস্বান্ত হইয়াছে। আদালতের কাগজপত্রে জানা যায় যে শতকরা ১২৲ টাকা হইতে তিন শত টাকা সুদ কৃষকেরা দিয়াছেন। অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে যে কৃষক সারা জীবন মহাজনের সুদের পয়সা যুগাইয়াছে তবুও তাহাদের ঋণের ভারী বোঝা কমে নাই। বর্ত্তমানে কৃষকগণ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা আর মহাজনের সুদের পয়সা গণিতে পারিতেছে না; তাই বহু মহাজনের টাকা আটক পড়িয়া গিয়াছে। মহাজন ও টাকাওয়ালারা নতুন ফন্দী করিয়া, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি

খুলিয়া লাভবান হইবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু দেশের মধ্যে যে গণ-জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

কৃষকের ঋণ

দেনার দায়েও কৃষকের জমি হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। বাংলাদেশে কৃষকের ঋণের পরিমাণ যে কত বেশী তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাংলার কৃষকের ঋণের পরিমাণ দুইশত কোটী টাকার কম হইবে না। এই টাকার সুদ শতকরা ১২৲ টাকা হইতে শতকরা ৩০০৲ টাকা অর্থাৎ এক টাকায় তিন টাকা। ১৯২৯ সাল হইতে বাণিজ্যিক সঙ্কট দেখা দেয় এবং তখন থেকেই কৃষকের ফসলের মূল্য কমিয়া যায়। যত তাড়াতাড়ি ফসলের মূল্য কমিয়াছে তত তাডাতাড়িই কৃষকের দেনা বাড়িয়াছে। এই দুইশত কোটী টাকা ঋণের সঙ্গে বাকি খাজনা যোগ করিলে কৃষকের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩০০ কোটী টাকার উপরে। এত ঋণ পরিশোধ করার মত ক্ষমতা কৃষকের নাই। সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে বাংলাদেশে যে ৫৫ লক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজা পরিবার আছে তাহাদের মধ্যে ২২।২৩ লক্ষ পরিবারের জমিজমা সমস্তই দেনার দায়ে মহাজন ও লোন কোম্পানীর হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এইভাবে জমির স্বত্ব কৃষকের হাত হইতে বাহির হওয়ার দরুণ লক্ষ লক্ষ কৃষক আজ দিন-মজুরে পরিণত হইতেছে। দিন-মজুরদের দুঃখের সীমা-পরিসীমা নাই। বাংলাদেশে দিন-মজুরের আয় গড়ে দৈনিক মাথাপিছু ছয়পয়সা হইতে তিন আনা। এই আয়ে পরিবার সহ একজন মানুষ কেমন করিয়া বাঁচিতে পারে ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়! এমন অবস্থায় লোকের শরীরে ব্যাধি প্রবেশ করিয়া, ম্যালেরিয়া, ক্ষয়রোগ ঢুকিয়া আমাদের দেশকে উজাড় করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সরকার আইন করিয়া যে ঋণ-সালিশী বোর্ড করিয়াছেন তাহাতে খাতকের বিশেষ উপকার হইবে না; কারণ কিস্তিবন্দী হারে ঋণ পরিশোধ

করার ক্ষমতাও হাজার হাজার কৃষকের নাই। কিস্তি খেলাপ্ হইলেও কৃষকের জমি নীলামে উঠে ও তাহা হাতছাড়া হইয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে সুদখোরগণ কৃষককে বেগার খাটাইয়া লয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে এই প্রথার রদ না হইলে কৃষকের মুক্তি নাই।

ভূমিহীন কৃষক

ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর হিসাব মতে শুধু বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ২৮ লক্ষেরও অধিক। তাহার পর দেশের উপর দিয়া একটা সঙ্কটের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ফসলের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় কৃষকের অবস্থা ভীষণ খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় কৃষকের জমি দ্রুতগতিতে হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াছে। তাই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তারপর এমন সব কৃষক আছেন যাহাদের সম্বল মাত্র দুই এক বিঘা জমি। এই জমির দ্বারা তাহাদের কোন রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ইহাদেরও ভূমি-মজুরের পর্য্যায়ে অনায়াসে ফেলা যাইতে পারে। এই সকলকে মিলাইয়া ধরিলে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা আজ বাংলাদেশে শতকরা ৫০।৬০ জন হইবে।

আমাদের দেশে কলকব্জা বাড়িতেছে না যে এই বিরাট ভূমিহীন কৃষকবাহিনী কারখানায় কাজ পাইতে পারে। যে সকল কারখানা বা ফ্যাক্টরী আছে সেখানেও বহুলোককে ছাঁটাই করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কাজেই বেকারের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। বাংলাদেশের চটকলগুলি হইতে মালিকগণ প্রায় হাজার হাজার মজুরকে ছাঁটাই করিয়া দিয়াছে। আজ ভূমিহীন ও বেকার সমস্যা আমাদের সামনে আর সকল সমস্যা অপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে।

জমিদারী-প্রথা

আমরা যে জমি-ব্যবস্থায় বাস করি তাহার নাম জমিদারী ব্যবস্থা।

ইংরেজ শাসকগণ আমাদের দেশে চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের আমলেই জমিদারগণ জমির মালিক হইয়াছে। আর গভর্ণমেণ্ট হইতেছে ভূমি-রাজস্বের মালিক। মোগল আমলে জমির-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল। তখনও কৃষকদের নিকট হইতে জমিদারগণ খাজনা আদায় করিতেন বটে কিন্তু তাহারা জমির মালিক ছিলেন না। তাঁহারা খাজনা আদায় করিয়া দেওয়ার জন্য একটা পারিশ্রমিক পাইতেন। এক কথায় তাহারা ছিলেন তহশীলদার।

ইংরাজ কোম্পানী মোগল বাদশার নিকট হইতে বাংলার রাজস্বের অধিকার লাভ করিয়া ইচ্ছামত রাজস্ব বাড়াইবার জন্য উদযোগী হইল। আকবর বাদশার সময়ে বাংলার রাজস্ব ছিল এককোটি সাতলক্ষ টাকা। মুর্শীদ কুলিখাঁর সময়ে মোট রাজস্ব ছিল ১ কোটি তিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা। ইংরাজ কোম্পানী বেশী রাজস্বের আশায় নূতন রকম বন্দোবস্ত করিল। পুরাতন জমিদারদের উপেক্ষা করিয়া কোম্পানী নূতন লোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর সর্ব্বোচ্চ জমায় নূতন করিয়া বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা হইল। ইংরাজ কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পাওয়ার পাঁচ বছর পরে—১৭৭০ সালে দেশে এমন এক দুর্ভিক্ষ হইল যে কোথাও উহার তুলনা মিলে না। এই দুর্ভিক্ষের ফলে দেশের তিন ভাগের একভাগ লোক মারা যায়। দুর্ভিক্ষ, শোষণ, দুর্ভিক্ষজনিত রোগ, মহামারীর ফলে দেশের লোকের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এতদ্ সত্ত্বেও সেযুগে কোম্পানী খাজনা আদায়ের জন্য যে জুলুম ও অত্যাচার করিয়াছিল জগতের ইতিহাসে আর কোথাও এরকম নিষ্ঠুরতার পরিচয় মিলে না।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন বড়লাট ছিলেন তখন কলমের এক খোঁচায় জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হইল এবং জমিদারগণ

জমির মালিক হইয়া বসিলেন। জমিদারগণকে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সরকারকে রাজস্ব দিতে হয় বটে, কিন্তু কৃষকদের খাজনা কেবল বাড়িতেই থাকে। জমিদারগণ সরকারী তহবিলে যে রাজস্ব দেন তাহা তিন কোটি টাকার বেশী নয় অথচ তাহারা আদায় করেন ১৬ কোটি টাকা। ১৬ কোটি টাকা দিয়াও কৃষকেরা নিস্তার পান না। তাহাদিগকে অন্য অনেক কিছু দিতে হয়। নানা স্থানে জমিদারগণ বে-আইনীভাবে অনেক কিছু আদায় করেন। জমিদারের নীচে অনেক মধ্যস্বত্বভোগী আছেন,—তাহারাও চাষীদের কম শোষণ করেন না। খাজনা, সেলামী, তহুরী, আবওয়াব, ঘুষ, দান, মাথট প্রভৃতি অনেক আদায় জমিদার, তাহাদের নায়েব গোমস্তাগণ করিয়া থাকে। এই সমস্ত অতিরিক্ত আদায়ের পরিমাণ আরও ষোল কোটি টাকা। এই সমস্ত টাকা কৃষকের গায়ের রক্ত জল করা টাকা।

অশিক্ষিত কৃষক খাজনা দিয়াও রেহাই পায় না। অনেক সময় খাজনা দিলেও রসিদ পায় না। যে টাকা কৃষকেরা শোধ করিয়া দিয়াছেন—তাহার জন্যও তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ হয়, ডিক্রী হয়, জমি ক্রোক হয় এবং অনেক সময় উহার খবর তাহাদের নিকট পৌঁছে না; যে দিন কৃষকদের সব কিছু বিকাইয়া যায় সেই দিন তাহারা নালিশ ও বিক্রীর খবর পায়। এই মিথ্যা প্রতারণার দ্বারা জমিদারের লাখ লাখ বিঘা জমি নিজেদের খাস করিয়া লইতেছেন। অনেক জায়গায় কৃষকগণ জমিদারের কেনা গোলামের মত হইয়া বাস করেন। নিজের দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট জমিতেও কৃষকগণ গোলামীর অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ২৪ পরগণার সুন্দর বনের আবাদী অঞ্চলে কৃষকদের উৎখাত করিয়া কলের লাঙলে চাষের প্রবর্ত্তন করিতেছেন।

খাসমহাল অঞ্চলেও বাংলার কৃষকেরা সুখে নাই। যদিও গবর্ণমেণ্ট এই নীতি মানিয়া চলেন যে খাস মহলের জমি শুধু কৃষকদের মধ্যেই

বিলি হইবে, কিন্তু জমিদারের সৃষ্টি খাস মহলেও হইয়াছে। কৃষকের উপর জুলুমও সেখানে যথেষ্ট হয়। খাসমহলের কর্ম্মচারিগণও বে-আইনী আদায় করেন। জুলুম, জবরদস্তী করিয়া সেখানেও কৃষককে ভিটা হইতে উচ্ছেদ করা হয়।

কৃষক-বিপ্লব

কৃষকের উপর অত্যাচার শুধু ভারতবর্ষেই হয় না। সাম্রাজ্যবাদী শাসন যেখানে শিকড় গাড়িয়া আছে সেখানেই শ্রমিক ও কৃষকদের উপর জুলুম, অত্যাচার, শোষণ, গুলি চলে। কাজেই কৃষকের এই অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক অবস্থার বিলোপ ঘটাইয়া। ধনতান্ত্রিক প্রথাই আমাদের ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইতে দিতেছে না; কাজেই কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্বীয় প্রতিষ্ঠান "কৃষক সমিতি" গঠন করিয়া এবং সহরের মজুরদের নেতৃত্বে ও সহযোগিতায় আগামী ভূমি-বিপ্লবের জন্য তৈরী হইতে হইবে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ আমাদের প্রধান শত্রু। তাহাকে তাড়াইতে হইলে কৃষকদের ভারতের সাম্রাজ্য-বিরোধী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে প্রকৃত, সংগ্রামাত্মক গণ-বিপ্লবের প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য আগাইয়া আসিতে হইবে। গণ-তান্ত্রিক ভূমি-বিপ্লব ব্যতীত বর্ত্তমান প্রথার পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়।

আপনারা জানেন, রুশ দেশের শ্রমিক ও কৃষকগণ কিভাবে তাহাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের ধ্বংশ করিয়া নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বর্ত্তমান চীনের শ্রমিক ও কৃষকগণ—এমন কি চীনের মুসলমান-গণও অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে একজোটে জাপানী ধনবাদীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই চালাইতেছে। কৃষক আন্দোলনের উদ্দেশ্য প্রথমতঃ কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা উদ্বুদ্ধ করা,—তাহাদের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করা। চেতনা জাগিলেই

তাহারা সংগ্রামে অগ্রসর হইবে। একটা নির্দ্ধারিত প্রোগ্রাম ও দাবীর উপর কৃষক-আন্দোলনকে খাড়া করিতে হইবে।

কৃষকেরা দারুণ দুরবস্থার ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের অবস্থা আরও খারাপ হইতে থাকিবে এখন হইতে আমাদের দেখিতে হইবে কি উপায়ে আমরা এই সকল দুরবস্থার হাত হইতে রেহাই পাইতে পারি। বর্ত্তমান সমাজের যে কঠিন শিকল আমাদের আষ্টে-পিষ্টে বাঁধিয়া রাখিয়াছে সেই শিকল ছিড়িয়া যদি আমরা বাহির হইতে না পারি, যদি আমরা নূতন সামাজিক ব্যবস্থার পটভূমি রচনা করিতে না পারি তাহা হইলে কিছুতেই আমাদের দুঃখ কষ্ট দূর হইবে না। বর্ত্তমান ধনবাদী সমাজ ঘুণ ধরিয়া শেষ অবস্থায় আসিয়াছে। চেনকে যেখানে আঘাত করিলে সহজে ভাঙ্গিয়া পড়ে আমাদেরও ধনবাদের সেই দুর্ব্বল অংশকে আঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।

কিন্তু নূতন সমাজ-ব্যবস্থা পত্তন করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের একটা সঙ্কটসঙ্কুল কঠোর পথ অতিক্রম করিতে হইবে—ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রামের পথ, তাহা পার হইতে হইবে। ধনবাদী শোষণ আমাদের কি অবস্থা করিয়াছে তাহা আমরা সকলে জানি। এই ধনবাদী সমাজ-ব্যবস্থার ভিতর থাকিয়া আমরা পিষিয়া যাইতেছি। সাম্রাজ্যবাদী বণিকশ্রেণীই এই ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। কাজেই তাহাদের শাসনের হাত হইতে মুক্ত হইতে হইবে, সব-কিছুর আগে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিতে হইবে। দেশের কৃষক ভাইদেরও রাজনীতিক লড়াইয়ে পুরাপুরি অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। কৃষকগণ যদি রাজনীতি হইতে দূরে সরিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহারা ভয়ানক ভুল করিবেন। তাহারা সংগ্রাকে জয়ের পথ হইতে দূরে ঠেলিয়া দিবেন। কিছুতেই কৃষকগণ এ ভুল করিবেন না। ইয়োরোপের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি খুব জটিল হইয়া উঠিতেছে। সাম্রাজ্যবাদী ফাশিষ্ট দস্যুর দল যুদ্ধের জন্য

দ্রুত প্রস্তুত হইতেছে। স্পেন আজ তাহাদের করতল গত প্রায়। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়কগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধের জন্য জার্মাণী ও ইটালিকে সাহায্য করিতেছে। যুদ্ধ যদি বাধে তাহা হইলে গত মহাযুদ্ধের ন্যায় আমাদেরও কম দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না; কাজেই আমাদেরও আসন্ন যুদ্ধের কালে স্বাধীনতার জন্য কি ভাবে লড়িতে পারি এখন হইতে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে আমরা কোন সাহায্য করিব না বরং যুদ্ধের সুযোগে স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড্ডীন করিব। মজুর ও কৃষকদের উপরই দায়িত্ব বেশী।

কৃষকের দাবী

কৃষক কি চায়? কৃষক চায় জমিদারী প্রথার-ধ্বংস। জমি চাষ করে কৃষক। কৃষিকাজ চালাইতে হইলে যে মূলধন চাই তাহা কৃষক জোগায়। ভারতীয় সমাজের ধনোৎপাদন ক্ষেত্রে কৃষি-কার্য্য একটি প্রধান অঙ্গ। সেই কৃষির বাহক এবং পরিপোষক কৃষকশ্রেণী। জমিদারের কাজ শুধু এই কৃষককে শোষণ করা।

কৃষকদের উপস্থিত যে সকল অভাব-অভিযোগ আছে সেই সকলের জন্যও কৃষকদের সমিতি গঠন করিয়া লড়াই করিতে হইবে। সকল প্রকার বে-আইনী আদায়, তহুরী, পার্ব্বণী, আবওয়াব ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে, তাহাদিগকে খাজনার হার কমাইবার জন্য লড়াই করিতে হইবে, ঋণ মকুব করিয়া দেওয়ার জন্যও তাঁহাদিগকে লড়িতে হইবে। এইরূপ যতপ্রকারের অভাব-অভিযোগ আছে, ছোটখাটো, অত্যাচার, জুলুমইত্যাদির দূর করিবার জন্য কঠোর সংগ্রাম চালাইতে হইবে। কোর্ফা রায়তেরা যাহাতে জমিতে স্বত্ব স্বামিত্ব পায় তাহার জন্য লড়াই করা চাই। বর্গাদারদের জন্যও আমরা লড়াই করিব। বর্গাদারদেরও জমিতে স্বত্ব পাওয়া উচিত এবং বেহারে তাহারা জমির

মালিককে ফসল দেন তাহা খুব বেশী। ফসলের রেট আরও কমাইয়া দিতে হইবে। গত বার বছরের ভিতর কৃষকদের যত জমি হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে সেই সমস্ত জমি কৃষকদিগকে ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আইনের দ্বারা কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের সর্ব্বনিম্ন দাম বাঁধিয়া দিতে হইবে। সরকারী তহবিল হইতে নামমাত্র সুদে কৃষকদিগকে টাকা কর্জ্জ দিতে হইবে। পাটের দর কমপক্ষে দশ টাকা হারে বাঁধিয়া দিতে হইবে। ধানের দর কমপক্ষে মণ প্রতি ৩৲ টাকা হওয়া চাই। ক্ষেত-মজুরের মজুরী বাঁধিয়া দেওয়া চাই। এই ধরণের উপস্থিত দাবীর জন্য তো সব সময়েই লড়িতে হইবে কিন্তু এই জাতীয় দাবী পূর্ণ হইলেই কৃষকেরা সকল দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তি পাইবেন না। বর্ত্তমান শাসনের ভিতরে থাকিয়া সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। তাহার জন্য দরকার ধনিক শ্রেণীর শাসনকে সরাইয়া দেওয়া। সাম্রাজ্যবাদী সরকার ভারতের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশক্তিমান জমিদার। সরকারের কথা ছাড়িয়া দিলে কৃষকের জমির সংগ্রাম এবং জমিদারী-প্রথা ধ্বংসের লড়াই মূলতঃ রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম এবং আসলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম। জমির জন্য কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রাম যত শক্তিশালী হইবে পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামও তত সবল হইবে—আবার পূর্ণ স্বাধীনতার লড়াই সুসম্পন্ন না হইলে জমিদারী-প্রথা ধ্বংস হইবে না বা জুলুমেরও অবসান ঘটিবে না। কৃষক-বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় বিপ্লবের কেন্দ্রীয় শক্তি। পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা দ্বারা অর্থাৎ বৃটীশ ধনিক-শ্রেণীর শাসন যখন চলিয়া যাইবে তখন দেশের পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিগণের ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত একটা শাসন ব্যবস্থাকারী রচনাকারী সভা—গণ-পরিষদ ডাকা হইবে এবং সভা স্থির করিবে—দেশের শাসন-ব্যবস্থা কি রকমের হইবে। কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলী বা গণ-পরিষদের মারফৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া কৃষক-সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান

অসম্ভব—আবার কৃষক সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন এড়াইয়া জাতীয় স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে সকলের অপেক্ষা কৃষকেরাই লাভবান হইবে; কেননা স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্ত্তন দেশে আসিবে সেই পরিবর্ত্তনের ফলে কৃষকদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাও বদলাইয়া যাইবে। কৃষক তখন জমির মালিক হইবেন। তখনই উন্নত ধরণের কৃষি-কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে। কৃষকদের উপর শোষণ করিবার কেহ থাকিবে না; ফলে তাহাদের অর্থনীতিক অবস্থারও দ্রুত উন্নতি হইবে। কাজেই বর্ত্তমানে দেশে স্বাধীনতার যে লড়াই চলিতেছে, সেই লড়াইয়ে কৃষক ভাইদের আগাইয়া আসিতেই হইবে। আর কৃষকেরা যদি লড়াইয়ে আগাইয়া না আসেন তাহা হইলে স্বাধীনতার লড়াইও থামিয়া যাইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষকভাইদের অধিকার বোধ না জন্মিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের ভাগ্যের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। স্বাধীনতা লাভের পরই তাহাদের হাতে ক্ষমতা আসিতে পারে। উপস্থিত দাবী-দাওয়া আদায় করিবার জন্য কৃষকদিগকে দল বাঁধিতে হইবে। সহরের কলকারখানার মজুরেরাও কৃষকদের মত ধনী-কলওয়ালাদের হাতে শোষিত হইয়া থাকেন। তাহারা একত্রে বাস করেন ও একত্রে কাজ করেন বলিয়া খুব তাড়াতাড়ি সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারেন। মজুরদের জীবন কতকটা সৈনিকের মত। লড়াইএর কায়দা তাহারা বেশ জানে। তাহাদের সঙ্গে একযোগে আমাদের কৃষকভাইদের স্বাধীনতার লড়াই করিতে হইবে। সংখ্যায় যতই কম হউক না কেন, মজুরেরা কৃষকদের চেয়ে সুসঙ্ঘবদ্ধ, লড়াইএর ঘাটিগুলি তাহাদের দখলে; কজেই স্বাধীনতা সংগ্রামের তাহারা কৃষকদের দোসর ও নেতা।

কৃষক ভাইগণ! আপনারা কিছুতেই একথা মনে স্থান দিবেন না যে আপনারা ছোট লোক, নীচ ও অধম। আপনারা দুনিয়ার সব ধন-দৌলত

পয়দা করেন, সকলের পেটের ভাতের ব্যবস্থা করেন, আপনারা যদি ছোট লোক হন তাহা হইলে ছোট লোক যে কাহারা নহে তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না। যাহারা আপনাদের অজ্ঞান রাখিয়া আপনাদের বোকা বানাইয়া নিজের সুবিধা করিয়া লইতে চাহে, তাহারাই শুধু কপালের লেখার কথা ও পূর্ব্বজন্মের পাপের কথা আপনাদের বুঝাইয়া থাকে। এই সমস্ত ধোকাবাজীর জাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আপনাদের বাহির হইতে হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাশিয়া জারতন্ত্রের হাত হইতে স্বাধীন মজুর কৃষকদের হাতে আসিয়াছে। সেখানকার কৃষকদের অবস্থা বিশ বছর আগে ঠিক আমাদের কৃষকদের মতই ছিল। স্পেনের কৃষকগণ গণতন্ত্র এ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গত তিন বছর কিরকম বীরত্বের সঙ্গে লড়িতেছে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। চীনের কৃষকগণও জাপানের বিরুদ্ধে ঐ রকম লড়িতেছেন। আমরা ভারতের মজুর ও কৃষকগণ তাহা কেন পারিব না?

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা—

আজ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে আমাদের খুব ভাবাইয়া তুলিয়াছে। এই মুর্শিদাবাদ জেলাতেও কয়েক বছর আগে হিন্দু-মুসলমান ভাইগণ ধনিক জমিদার-শ্রেণীর প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া, নিজের পারস্পরিক স্বার্থ ভুলিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়াছে। তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমান কৃষক ভাইদের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বর্ণণাতীত। বিচারে হিন্দু-মুসলমান কৃষকগণ জেলে প্রেরিত হইয়াছে, আর তাহাদের পরিবার প্রভৃতি না খাইয়া মরিয়াছে। আমি জেলে থাকাকালীন অনেকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি; তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে যে ইহাতে তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে এবং লাভবান হইয়াছে তাহাদের শোষণকারী জমিদারের দল।

আজও মুসলমান ভাইদের স্বাধীনতা ও কৃষক আন্দোলন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য প্রতিষ্ঠাবান ধনিক স্বার্থপর লোকগণ কম চেষ্টা করিতেছেন না। হিন্দু-মুসলমান যুগযুগ ধরিয়া এক সঙ্গে বাস করিয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনদিন বিরোধ দেখা যায় নি। তাহারা পরস্পর ভায়ের মত বাস করিয়াছে, পরস্পরের সুখদুঃখে সাহায্য করিয়াছে। একের বিপদে অন্য ছুটিয়া আসিয়াছে। কিন্তু স্বার্থপর লোকেরা আজ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে শিথিল করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। আপনারা ইহাদের ধাপ্পাতে ভুলিবেন না; যাহাতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা স্থাপিত হয় আবার পূর্ব্বের সহজ অবস্থা ফিরিয়া আসে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। একদেশে যাহারা বাস করে, এক ভাষায় কথা বলে, এক পোষাক পরে,—প্রকৃতির মার উভয়ের উপর সমানভাবে পড়ে। তাহারা কিরূপে পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হইতে পারে তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

আমি আপনাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে আপনারা এই সব লোক হইতে সাবধান হইবেন। এই সব লোকের কেহ জমিদার, কেহ নবাব, কেহ রাজা মহারাজা। তাই স্বধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কেহ আপনাদের কম শোষণ করে না। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা চাকুরীক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু ইহার মূলে কি সমস্যা রহিয়াছে? আসল সমস্যা হইতেছে, অর্থনীতিক সমস্যা, কিন্তু স্বার্থান্ধ লোকগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতার আড়ালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া থাকে। বর্ত্তমান শাসনের আইন কানুন হিন্দু-মুসলমানের উপরে সমানভাবে প্রযোজ্য। শাসকশ্রেণী শোষণের বেলায় হিন্দু-মুসলমান বলিয়া কোন পক্ষপাতিত্ব করে না বটে কিন্তু তাহাদের শাসন কায়েম রাখিবার জন্য তাহারা

ভেদনীতির আশ্রয় লইয়া থাকে। চাকুরী সমস্যা বড় সমস্যা নয়। আজ যদি সব চাকুরী হিন্দু কিংবা মুসলমান পায় তাহা হইলেও এই বিরাট দেশের জনগণের আর্থিক সমস্যার সমাধান হইবে না। দেশ স্বাধীন হইলে, দেশের শিল্প, কলকারখানা বৃদ্ধি পাইলে দেশ জমিদারশ্রেণীর হাত হইতে মুক্ত হইলে আমাদের হিন্দু-মুসলমান কৃষকভাইদের জীবিকার সমস্যা দূর হইবে—সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতার অবসানও হইবে। কিন্তু প্রকৃত ঘটসা তাহা নয়। উভয় শ্রেণীর শোষক ও জমিদার, ধনীরা জানে যে মজুর-কৃষকরা যদি স্বাধীন হয় তাহা হইলে তাহাদের সুখরবি অস্তমিত হইবে এবং এই জন্যও তাহারা সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিয়া থাকে। হিন্দু, মুসলমান কিংবা খৃষ্টান ও বৌদ্ধ হিসাবে কোন প্রকার রাজনীতি চলিতে পারে না। ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে কোন প্রকার রাজনীতিক দল, অথবা আর্থিক দাবী-দাওয়া আদায় করিবার জন্য সভাসমিতি গঠন হইতে পারে না। এই সকল সঙ্ঘ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গঠিত হয়। কৃষকদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মের লোক আছে। শ্রমিকদের মধ্যেও তাহাই। মুসলমান জমিদার হিন্দুকৃষকের উপরে কম জুলুম করিয়া থাকে বলিয়া আমরা কখনো শুনি নাই। হিন্দু মহাজন হিন্দু খাতকের নিকট হইতে, অথবা মুসলমান মহাজন বা জমিদার মুসলমান খাতকের নিকট হইতে কম সুদ বা খাজনা লইতেছেন এমনও দেখা যায় না। মজুরদের সম্বন্ধেও ঐ কথাই খাটে। কারখানার মালিক হিন্দু হউক, মুসলমান কিংবা খৃষ্টান হউক—মজুর শ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে এক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে না থাকিয়া তাহাদের দাবী-দাওয়া আদায় করিতে পারে না। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইলে মালিকেরই সুবিধা বেশী, কেননা কোন মজুর কোন দিনই কোন সংগ্রাম করিতে পারিবে না। ধনিকশ্রেণী যে আইন প্রণয়ন করে

তাহা হিন্দু-মুসলমান গণসাধারণের জন্য পৃথক করিয়া করে না। অন্যায় আইনের কবলে হিন্দু-মুসলমান সকলকেই সাজা ভোগ করিতে হয়। কৃষক বা শ্রমিক আন্দোলন দমন কল্লে হিন্দু মুসলমান বাছিয়া আইনের ব্যবহার করে না। কানপুর, বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানে যখন পুলিশ গুলি চালাইয়াছিল, তখন তাহারা হিন্দু মুসলমান বাছিয়া বাছিয়া গুলি করে নাই! আপনারা হয়তো জানেন, বিহার প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১০ দশ জন। জমিদার হিন্দুই বেশী এবং কৃষকদের ভিতর হিন্দুর সংখ্যাও বেশী। অথচ সেখানে কৃষক আন্দোলন খুব জোরের সাথে চলিতেছে। এই সকল কাজ যদি ধর্ম্মগতভাবে চলিত তাহা হইলে বিহারে এত জোরে কৃষক আন্দোলন হইতে পারিত না—এবং জমিদারশ্রেণীও ইহাকে দমন করিত না।

ভাই কৃষকগণ! স্বার্থপর লোকেরা নিজদের স্বার্থ হাসিল করিবার জন্য আপনাদের ভুলপথে চালাইতেছে। আপনারা এই সকল স্বার্থপর লোকদের সম্বন্ধে সচেতন ও হুশিয়ার থাকিবেন। আপনাদের ধর্ম্মের নামে উসকাইয়া কতকগুলি লোক শুধু তাহাদের নিজেদের স্বার্থ পুরা করিয়া লইতে চাহে।

আপনারা মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিলে তাহাদের কিছু আসে যায় না। ধর্ম্ম আপনাদের ব্যক্তিগত জিনিষ—আপনাদের আপন আপন ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখিয়াও স্বীয় শ্রেণী স্বার্থের জন্য, ভাত কাপড়ের সংগ্রামের জন্য, যাহাদের সহিত আর্থিক স্বার্থের যোগ আছে তাহাদের সঙ্গে এক জোটে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। এখানে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টানের প্রশ্ন উঠিতে পারে না এবং যদি করেন তাহা হইলে তাহাতে আপনাদেরই সমূহ ক্ষতি।

আমি হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধে এত কথা বলিতাম না। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে আজো আমার মুসলমান কৃষক ভাইগণ সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও কৃষক আন্দোলনে কৃষক সমিতিতে যোগ দিতেছেন না বরং ইহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। আমি জানি যে সমস্ত যুবক আজ শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে কাজ করিতেছেন, তাহাদের একজনও হিন্দু মুসলমানের পৃথক স্বার্থের জন্য কাজ করিতেছেন না, প্রত্যেকেই নিঃস্বার্থভাবে সমগ্র কৃষককুলের স্বার্থের জন্য কাজ করিতেছেন। আশা করি আপনারা এ সম্বন্ধে ধীর স্থিরভাবে বিচার করিয়া কাজ করিবেন।

কৃষকের কর্ত্তব্য

কৃষক বন্ধুগণ, আমি আপনাদের অনেক সময় লইয়াছি। আশা করি আপনারা আমার এই সকল মন্তব্য বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ও কৃষক আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য যে কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করা, কৃষকের দাবী পূরণ করা, কৃষকের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা আনিয়া দেওয়া, তাহা বুঝিয়া আপনাদের সংগ্রামকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন। আপনারা দলবদ্ধ হইয়া, কৃষক সমিতি গঠন করিয়া আপনাদের দাবী দাওয়ার জন্য লড়াই করুন। দেশে স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই চলিতেছে কৃষক-আন্দোলন সে লড়াই হইতে পৃথক নয়। স্বাধীনতার লড়াই আপনাদের লড়াই। আপনারা যদি এই লড়াইয়ে যোগদান না করেন তাহা হইলে আপনারা মরিবেন।

একটা কথা আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। বর্ত্তমানে দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ তাহাদের শাসকদের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই চালাইতেছে। পশ্চাদপদ দেশীয় রাজ্যের কৃষকগণ জোর আন্দোলন চালাইতেছে। আপনাদেরও উচিত জোর কৃষক আন্দোলন করিয়া

তাহাদের লড়াইয়ের সাহায্য প্রদান করা। আর আমি বেশী কিছু বলিব না। এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

কৃষকদের লড়াই জয়যুক্ত হউক।
সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক।
জমিদারী প্রথা ধ্বংস হউক।
জমির মালিক হইবে কৃষক।
স্বাধীন ভারতের জয়।
ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ॥

২রা এপ্রিল, ১৯৩৯
সর্ব্বাঙ্গপুর, মুর্শিদাবাদ।

আবদুল্লা রসুল

—ময়মনসিংহ—

[পাঁচ]

কৃষক ভাই সকল,

আপনাদের এই জেলা ধনে, জনে এবং আয়তনে বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ। এ জেলার আয়তন ৬২৮০ বর্গ মাইল। বালুর চর, সবুজ পাহাড়, গভীর জঙ্গল, বিস্তৃত জলাভূমি, উর্বর শস্যক্ষেত্র—এ সবেরই সমাবেশ এ জেলায় রহিয়াছে। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে উত্তর ময়মনসিংহে নদীগুলি ভরিয়া গিয়া বিশাল চর পড়িয়াছে। দেওয়ানগঞ্জ ও সেরপুরের অধিকাংশ পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের গর্ভে ছিল, এখন তা মানুষের আবাসে পরিণত হইয়াছে। ময়মনসিংহের মাঝখানে ও পশ্চিম প্রান্তে মধুপুরের জঙ্গল। পুখুরিয়া পরগণার উঁচু জমি—অসংখ্য শালগাছে তা ঢাকা। ভালুকার দিকে ১০০।১৫০ ফুট উঁচু ছোট ছোট পাহাড়ের মতো লাল রংএর উঁচু টিলা।

ইহাদের মধ্য দিয়া সাপের মতো ছোট ছোট খালগুলি আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, আশে-পাশে তার ধানের ক্ষেত। আলাপসিং, ফুলপুর ও মধ্য ময়মনসিংহের জমিগুলির যে মাটির নাম আপনারা দিয়াছেন "বৈদ", তাতে এমন ফসল নাই যা পয়দা হয় না। জেলার বাকি অংশের জমির মাটি কাদা আর বালি মিশান। নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের পূর্বদিকের জমি একেবারে ভিন্ন রকমের। নদী আর খালের অন্ত নাই। সবার আগেই এখানে বর্ষা দেখা দেয়, আবার জল শুকায়ও সকলের পরে। তাই কোন ফসল বোনবারই সময় এ অঞ্চলে প্রায় হইয়া উঠে না। পৌষ মাঘ মাসে বোরা ধান বোনা হয়।

নদীনালা পূর্ব অঞ্চলে বহুত আছে, কিন্তু জেলার উত্তরে ও মাঝখানে জলাভাব বেশি। টাঙ্গাইলের নদীগুলি দ্রুত মরিয়া যাইতেছে। আজ ঝিনাই নদীর যদি এই দুর্দশা হয়, তবে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে? ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও ধলেশ্বরী এই তিনটির সহিত মিলিয়াছে ঝিনাই নদী।

কৃষকের অবস্থা

বর্তমানে এ জেলার লোক সংখ্যা ৫১ লক্ষের উপরে, ১৯১১ সালে ছিল ৪৫ লক্ষের কিছু বেশী। ১৮৭২ সালে প্রথম আদমশুমারিতে লোক-সংখ্যা ছিল সাড়ে ২৩ লক্ষ। কৃষিই এই সমস্ত লোকের জীবিকার প্রধান উপায়। এক সময় বস্ত্র-শিল্পের জন্য বাজিতপুর ও কিশোরগঞ্জ ঢাকার মতই প্রসিদ্ধ ছিল। নীলকুঠিগুলি ১৮৭৯ সালের পূর্বেই বন্ধ হইয়া যায়। পাট এ জেলায় প্রচুর হয়। কিন্তু এত পাট হওয়া সত্ত্বেও পাটের উপর কোন শিল্প গড়িয়া উঠে নাই।

একান্ন লক্ষের ভিতর হয়তো বা এক কি সওয়া লক্ষ লোক কোন-না-কোন হস্তশিল্প হইতে জীবিকা অর্জন করেন। শুধু মাছের ব্যবসার উপর এ জেলার প্রায় ২ লক্ষ লোকের দিন গুজরান হয়। ১৯১১ সালে কৃষকের সংখ্যা ছিল সাড়ে ৩৫ লক্ষ। আর যারা জমিতে খাটিয়া খাইত অর্থাৎ দিন-মজুরেরা, তারা ছিল ১ লক্ষ ৫৬ হাজার। খাজনার উপর যারা নির্ভর করে, জমিদার তালুকদারের দল, তাদের সংখ্যা ছিল ৭৪,৭৮৫। এদের নায়েব গোমস্তা, পাইক বরকন্দাজ ইত্যাদির সংখ্যাও কম নয়, ১৬,০০০এরও উপরে।

১৯৩১ সালের আদিমশুমারি হইতে দেখা যায়, এ জেলার মোট ৫১ লক্ষ লোকের ভিতরে উপার্জন করে প্রায় ১০ লক্ষ লোক। তার মধ্যে প্রায় সওয়া ৬ লক্ষ কৃষক। যারা খাজনা আদায় করে, অর্থাৎ জমিদার তালুকদার, তাদের সংখ্যা ৫৩,২৫৯। কৃষি-মজুর প্রায় ১০ লক্ষে আসিয়া পৌছিয়াছে; কোথায় ১৯১১ সালে তারা ছিল ১ লক্ষ, আর ২০ বৎসরে বাড়িয়া হইয়াছে, ১০ লক্ষ! কিন্তু মজার কথা এই যে জমিদার তালুক-দারের সংখ্যা প্রায় ২১ হাজার কমিয়াছে। ইহার মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই; কেননা, জমিদারের সংখ্যা কমিলেও জমিদারীর আয়তন বাড়িয়াছে।

আয়-ব্যয়ের হিসাব

এ জেলায় মোট জমির শতকরা ৭০ ভাগ আবাদী-জমি। এই ৭০ ভাগের আবার শতকরা ২৫ ভাগ দো-ফসলা। মোট জমির শতকরা ১৯ ভাগ চাষের অযোগ্য, ১১ ভাগ এখনো অনাবাদী থাকিলেও কৃষির অযোগ্য নয়। শুধু কিশোরগঞ্জের কথা ধরিলে দেখা যাইবে, মোটের উপর শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগ জমি চাষ হয়, ১৫ ভাগ চাষের অযোগ্য, আর ১০ ভাগের মতন অনাবাদী কিন্তু তাহাতে ফসল ফলান যাইতে পারে।

শ্রাবণ হইতে কার্তিক মাসের মধ্যে আমন ধানই এ জেলার প্রধান শস্য। পূর্ব অঞ্চলের নিচু জমিগুলিতে শীতকালে বোরো ধানই প্রধান ফসল। এই অঞ্চল ছাড়া অন্য সর্বত্রই পাটের চাষ প্রচুর হইয়া থাকে। এক একর বা প্রায় তিন বিঘা জমিতে পাট জন্মে ১৬ মণ। ১৯২০ সালের আগে ৫,৬৬,৬০০ একর জমিতে পাট চাষ হইত; তার মোট ফসল ধরা যাইতে পারে ৩,৩৬,০০০ টন (এক টন প্রায় ২৮ মণ)।

চাষের খরচের মধ্যে পড়ে প্রধানত লাঙ্গল ও গরুর খরচ আর মজুরী। একটী লাঙ্গলের দাম প্রায় তিন টাকা। এ জেলার প্রতি ৫ একর জমির জন্য আছে গড়ে দেড়টি গরু কিন্তু ৫ একরের জন্য দরকার কমপক্ষে দুটি গরু। একটি ফসলের জন্য ৫ একর জমিতে অন্তত ৭৫ দিনের মজুরী লাগে। এক জোড়া গরুর দাম ৮০৲ টাকা এবং চাষের যন্ত্রাদি বাবত ৫৲ ধরিলে অন্তত ৭ বৎসরের জন্য ৫ একর জমির চাষের বাবত পুঁজির পরিমাণ হইবে ৮৫৲ টাকা। ১৯২০ সালের পূর্বে ময়মনসিংহে চাষীর ফসলের খরচা বাদ দিয়া যে মুনাফা অবশিষ্ট থাকিত, মোটামুটি হিসেবে তাহার পরিমাণ ১১,৬১,৬৫,০৮৩৲ টাকা। প্রতি একরে ৪৲ টাকা হিসাবে খাজনা বাদ দিলে মুনফা অবশিষ্ট থাকিবে ১ কোটী ৫৫ হাজার টাকা। তা হ'লে মাথা পিছু গড়ে মুনফা হইবে ২৮৲ টাকা আর প্রতি কৃষক পরিবারের গড়ে হইবে ১৩৯৲ টাকা। ১৯৩১ সালের পরে ফসলের

দাম শতকরা ৩০\।৪০\ টাকা হারে কমিয়া গিয়াছে। এই হিসাবে দেখিতে গেলে এ জেলার কৃষকের বর্তমান বার্ষিক আয় মাথা পিছু গড়ে ১৬\।১৭\ টাকার বেশি নয়। ১৯২০ সালের আগের হিসাব মোতাবেক এখনকার বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষকের আয়ের অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায় :—

৩০ হাজার কৃষক-পরিবারে অর্থাৎ জেলার মোট কৃষক পরিবারের চার ভাগের এক ভাগের নিট আয় ৮০০\ টাকার উপর ; ইহাদের প্রতি পরিবারের জমির পরিমাণ ১২ একর। ২,৭০,০০০ কৃষক পরিবারের প্রত্যেকের গড়ে ২৪০\ টাকার উপর আয় ; ইহাদের প্রত্যেকের হাতে আছে ৫ একর জমি। যে সকল কৃষক পরিবারের নিট আয় বলিয়া কিছুই নাই, তারা মোট কৃষকের শতকরা ৬০ ভাগ ও তাদের মোট সংখ্যা ৪৫০,০০০ ; দুই বিঘা করিয়া তাদের প্রত্যেক পরিবারের জমির পরিমাণ। ইহারা জমির উপরে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া আছে, মুনফা বলিয়া উহাদের কিছু নাই। ১৯৩০ সালের পরে অর্থাৎ গত কয়েক বছরের দুর্দিনে শেষোক্ত শ্রেণীর সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে।

রায়তের দুরবস্থা

১৯০৮ সালে সেসের হিসাব লইতে গিয়া দেখা গিয়াছে, সকল শ্রেণীর জমিদার তালুকদারের নিট আয় ৮৫,২৩,৯৬৩\ টাকা ; গবরমেণ্টেকে জমিদার তালুকদাররা রাজস্ব দিয়া থাকে ৮।৯ লক্ষ টাকা। কিশোরগঞ্জ মহকুমার বড় হাওর নানা কারনেই উল্লেখযোগ্য ; ৫০০০ বিঘা ইহার আয়তন। এই জমির জমিদারেরা মাত্র ১০ টাকার নির্দিষ্ট জমায় ইহা বন্দোবস্ত লইয়াছিল। জোয়ানসাহী পরগণার খারিজা তালুকগুলির জমাও অত্যন্ত কম। লাখেরাজ এষ্টেটের সংখ্যা প্রায় ১৬০০ ; ইহাদের আয়তন ১৩,৩৯৬ বিঘা। এই জমির উপর কোন প্রকার কর ধার্য নাই।

১৯০৮—১৯৯১এর সেটেলমেণ্টে রিপোর্টে দেখা যায়, এ জেলায়

জমিদারদের খাস জমির পরিমাণ ৫,১৬,০২৪ একর; ইহা মোট জমির শতকরা ১৩ ভাগের এক ভাগ। মধ্যস্বত্বভোগীদের নিজ জমির পরিমাণ ৩০৬,৭২২ একর; ইহা শতকরা প্রায় ৮ ভাগ। রায়ত ও কোরফা রায়তের হাতে আছে প্রায় ৩০ লক্ষ একর অর্থাৎ শতকরা ৭৬ ভাগ। গত কয় বৎসরে জমিদার মধ্যস্বত্বভোগী এবং মহাজনদের হাতে রায়তের বহু জমি চলিয়া গিয়াছে। প্রায় ২০ বছর আগের শতকরা ২০ ভাগের জায়গায় যে ইহা ৩০ ভাগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। জেলার ৮ ভাগের ১ ভাগ জমি জমিদারের খাস। সুসং, আটিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ১০,০০০ ধান-কড়ারি রায়ত আছে; ইহারা ৭৫ হাজার মণ ধান খাজনা হিসাবে দিয়া থাকে। ইহার অধিকাংশই পাইয়া থাকে মধ্যস্বত্বভোগীরা। বর্গাদারদের নিকট হইতে ইহারা অন্তত আরো দ্বিগুণ পরিমান ধান পায়। ধান-কড়ারির ধান হয়তো বা ঠিকই আছে কিন্তু গত কয় বৎসরে জমি হস্তান্তরিত হওয়ায় বর্গাদারের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

এ জেলায় গড়পড়তা জমির আয়তন আড়াই একর। মোকররি স্বত্বের রায়তী জোত এখানে খুবই কম। বেশির ভাগ রায়তই দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট অথবা দখলীস্বত্ববিহীন। ১৯২০ সালের পূর্বে রায়তের হাতের ৩০,১৫,৮৮১ একর জমির ভিতরে ১,২৪,১৭২ একর জমি ছিল কোরফা রায়তের নিকট। কোরফা রায়তের জমির খাজনা রায়তী জমির খাজনার অন্তত দেড় গুণ। বর্তমান সময়ে রায়তী জোতের সংখ্যা কমিয়া ভাগচাষী এবং কোরফা রায়ত ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বে আবাদী জমির চার ভাগের এক ভাগ আধিয়ারদের হাতে ছিল। নেত্রকোণায় গত ১৯১৩ সালে তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছিল, শতকরা ৪২ ভাগ বর্গাদারকে মালিক বীজ দিয়া থাকে, আর দুই ভাগ বর্গাদার মালিকের নিকট হইতে গরু ও লাঙ্গল ইত্যাদি পাইয়া থাকে।

এখন এই অঞ্চলের কাছাকাছি দুইটি পরগণার একটু বিবরণ দিব। জোয়ানসাহী ও তপেহাজরাদি পরগণার অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন। জোয়ানসাহীর আয়তন তিনশত বর্গমাইল। গবরমেণ্টের রাজস্ব ৩০,১৭২৲ টাকা। মল্লিকদের মোট আয় ১,৪৯,০০৭৲ টাকা। তা ছাড়া জলকর ইত্যাদি আদায় তো রহিয়াছেই। সরকারের রাজস্ব প্রতি একরে মাত্র দশ পয়সা অথচ জমিদারের খাজনা ১৮৶৹। গড়পড়তা খাজনার কথাই আমি বলিয়াছি কিন্তু এমন জমিও আছে যাহার একর প্রতি খাজনার পরিমাণ ২৫৲ টাকা।

খাজনা বাড়াইবার কৌশল

তপেহাজরাদি পরগণার কেন্দ্রস্থল কিশোরগঞ্জ। এখানকার তালুকদারেরা ৫৬ হাজার টাকার কিছু কম সরকারকে রাজস্ব দিয়া থাকে অথচ তাহাদের আয় ৩ লক্ষ টাকা। প্রথম শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা এখানে ১০ হাজার, রায়ত ১ লক্ষ। মধ্যস্বত্বভোগীর খাজনা ১৶৹, স্থিতিবান রায়তের ৩৸৶৹ আর কোরফা রায়তের ৫৸৴৹। কিশোরগঞ্জ, কোটিআদি বাজারের চান্দিনা রায়তেরা একর প্রতি ৩৫৲ টাকা হারে খাজনা দেয়।

আদালতের সাহায্য ছাড়া আপোষেই অনেক সময় খাজনা বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ১৯১৮ সালের পূর্বে কয় বছরে শতকরা ১৪ ভাগ রায়তী জমির খাজনা বৃদ্ধির নালিস আদালতে হইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় জমিদারের সপক্ষে আদালত রায় তো দিতই, মোকদ্দমার খরচও রায়তের উপর চাপান হইত। জমির পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা ফসলের মূল্য বৃদ্ধির দরুণ খাজনা বাড়াইবার তবুও একটা যুক্তি থাকে। কিন্তু এই খাজনা বৃদ্ধির মূলে তা নাই, আছে কেবল কতকগুলি ফিকিরফন্দী। তাহার হিসাব দৈনিক লওয়া প্রয়োজন। হাতের মাপ সাধারণত এ জেলায় ১৯½ ইঞ্চি। কিন্তু জাফরসাহী পরগণায় গৌরীপুরের জমিদারেরা দেড়

ইঞ্চি কমাইয়া ১৮ ইঞ্চি হাত চালু করিবার চেষ্টা করেন। এই উপায়ে টাকায় ।৵০ পর্যন্ত খাজনা তাঁরা বাড়াইতে পারিয়াছেন। জমি হস্তান্তরের সময় বহু জমিদার খাজনা বাড়াইতে চেষ্টা করে। আইনে আছে টাকা প্রতি দুই আনার বেশি খাজনা বাড়ান যাইবে না। কিন্তু যেখানে ফসলে খাজনা দেওয়া হয় সেখানে এরূপ কোন নিয়ম নাই। তাই অনেক জমিদার রায়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, এখন হইতে টাকায় না লইয়া ফসলে খাজনা লওয়া হইবে। কিছুদিন পরেই তারা ফসলে খাজনার হার ইচ্ছামত বাড়াইয়া লয়। পরে আবার সুবিধা মত ফসলে-খাজনাকে টাকায় পরিবর্তিত করে। এই প্রসঙ্গে সুসংএর ফসলে-খাজনার কথা একটু বলিব। সুসংএর এই প্রথাকে বলা হয় টঙ্ক। ইহা ধান-কড়ারিরই অন্য নাম। সুসংএর বর্তমান রাজাদের পূর্বপুরুষেরা প্রতি অর্হা জমি বাবত দুই টাকা হারে খাজনায় রায়তের সহিত বন্দো-বস্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তীরাজারা ইহা অস্বীকার করিয়া প্রতি অর্হায় ১৬ মণ পর্যন্ত ধান আদায় করিতে লাগিলেন। অথচ এক অর্হায় ২৫ মণের বেশি ধান কখনো জন্মে না।

জমিদারী জুলুম

জমিদারেরা অনেক সময়ই খাজনা আদায়ের সময় রায়তকে কোন প্রকার দাখিলা দেয় না। কোন কোন সময়ে অবশ্য তহশীলদার নিজের নাম দস্তখত করিয়া রোকা দিয়া থাকে। কিন্তু এই রোকায় উল্লেখ থাকে না, হাল সনের সমস্ত খাজনা উসুল হইল অথবা বকেয়া খাজনা কিছু পাওয়া গেল। ১৯০৯ সালে এইরূপ করার জন্য সেরপুরের তিনজন জমিদার ফৌজদারী সোপরদ্দ হয়। তাহাদের মধ্যে ময়মনসিংহের বিখ্যাত উকিল ও স্বদেশী যুগের নেতা অনাথবন্ধু গুহের বিরুদ্ধে মামলা টিকে নাই। সেরপুরের জমিদার রাধাবল্লভ চৌধুরীর নিকট হইতে

এক আনা অংশের জমিদারী কিনিয়াই তিনি শতকরা ৩০৲ হইতে ৫০৲ টাকা হারে খাজনা বৃদ্ধির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন।

রামগোপালপুর জমিদারী যখন ভাগ হইয়া যায় সেই সময় জমিদাররা নলের মাপ ছোট করিয়া টাকায় ৫।৭ আনা করিয়া খাজনা বাড়াইয়া লয়। ১০ পাখী জমির খাজনা পূর্বে ছিল ১৫৲ টাকা, এখন তাহা হইয়া দাঁড়ায় ২১৸০। যে সকল রায়ত এই অন্যায় জুলুম মানিয়া লইত না, জমিদারেরা তাহাদের অন্য উপায়ে সায়েস্তা করিত। জমিদার একজন রায়তের জমির একটি কবুলিয়ত অপর একজন রায়তের নামে রেজিষ্ট্রি করিয়া লয়। এই নূতন রায়তকে জমিদার দুই তিন বৎসরের জন্য খাজনার দাখিলা লিখিয়া দেয়। কিছুদিন পর দ্বিতীয় রায়ত জোর করিয়া জমির দখল লইতে চেষ্টা করে। প্রথম রায়ত দণ্ডবিধির ৪৪৬ ধারার সুযোগ লইয়া আদালতে উপস্থিত হইতে পারে বটে কিন্তু তাহার সপক্ষে কাগজপত্রের কোন নজির না থাকায় তাহার সর্বনাশকে ঠেকাইয়া রাখিবার কোন উপায় হইল না।

স্বার্থের বিরোধ

কৃষক ভাইগণ, এ জেলার জমিজমা ও কৃষকের দুর্দশার কাহিনী মোটামুটি বর্ণনা করিলাম। ১৯২০ সালের পূর্বের ঘটনাই আপনাদের কাছে বেশি করিয়া উপস্থিত করিয়াছি। কিন্তু গত ১৮ বৎসরের মধ্যে আপনাদের দুর্দশা যে কত বাড়িয়া গিয়াছে উপযুক্ত সংখ্যা দ্বারা তাহা সঠিক দেখাইতে না পারিলেও অনুমান করিয়া লওয়া কঠিন নয়। ১৯২১—১৯১৩ সালের মধ্যে দিন-মজুরের সংখ্যা যে বাড়িয়াছে সরকারী আদমশুমারির হিসাবেই আমরা তা দেখিতে পাই। ১৯৩১ সালের পরে ফসলের দাম শতকরা ৩০৲।৪০৲ টাকা হারে কমিয়া গিয়াছে। আপনাদের এ জেলা পাটের জন্য বিখ্যাত। ১৯২৫-২৬ সালে মণ প্রতি আপনারা

২৫৲।৩০৲ টাকাও পাইয়াছেন অথচ আজ তার দাম মণকরা ৫৲।৬৲ টাকা হইলেই খুব হইল। ফসলের মূল্য কমিয়াছে বটে কিন্তু জমিদারের খাজনা বা মহাজনের ঋণ এক কানাকড়িও কমে নাই। শুনিলে আপনারা অবাক হইবেন যে এই দুর্দিনেও বাংলা দেশে জমিদারের খাজনা পূর্বের চেয়ে শতকরা ১২৲ টাকা বা প্রায় টাকায় দুই আনা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জমিদারের স্বার্থ কৃষকের স্বার্থের কিরূপ বিরোধী তা ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

এই অবস্থায় কৃষকের রায়তী জোত অপরের হাতে চলিয়া যাইতেছে। বেশির ভাগ জমিই গিয়াছে জমিদার অথবা মহাজনের হাতে। কাল যে ছিল রায়তী জোতের মালিক সেই হয়তো আজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে আপন জমিতে ভাগচাষী। যাহার জমি আছে তাহাকে বেশি হারে খাজনা দিতে হইতেছে। যে খাজনা দিতে পারিতেছে না সে জমি ইস্তফা দিতেছে অথবা জমিদার তার জমি খাস করিয়া লইতেছে। আজ এই সংকটময় অবস্থায় আপনারা পড়িয়াছেন। কৃষকের গর্ব ও সম্বলই হইল একটী লাঙ্গল, একজোড়া গরু আর বিঘা দুই জমি। কিন্তু আজ সে সব-কিছু হারাইয়া পথে বসিয়াছে। যাহারা খাটিয়া খায়, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম পরিশ্রম করিয়া যাইতে যাহাদের আপত্তি নাই, তাহারা আজ বেকার বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছে। ইহা কি আশ্চর্য নয়? এ জেলায়—শুধু এ জেলাতেই নয়, সারা বাংলা দেশে এবং ভারতবর্ষে—এখনো চাষের যোগ্য অনাবাদী জমি অনেক পড়িয়া আছে। জমিও পতিত আছে, চাষীও বেকার রহিয়াছে, অথচ মজার কথা এই যে, এই দুয়ের মধ্যে যোগ স্থাপনের কোন ব্যবস্থা হইতেছে না. এমনি অদ্ভুত আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা!

শোষনের প্রতিকার

আজ এই অবস্থাটি কৃষককে বুঝিয়া লইতে হইবে। আমরা দেখিতে

পাই চাষীর মাথার উপর কতকগুলি লোক বসিয়া রহিয়াছে, তাহারা খাটে না, ধন উৎপাদন করে না অথচ সুখস্বাচ্ছন্দ্য তাহাদের আছে। তপেহাজরাদি ও জোয়ানসাহী ইত্যাদি পরগণার আলোচনায় আমি দেখাইয়াছি, রায়তের নিকট হইতে দুই টাকার মতো আদায় করিয়া তাহা হইতে মাত্র দশ পয়সা দেওয়া হয় সরকারকে। কোন রকম টাকা না খাটাইয়া অথবা এতটুকু মেহনত না করিয়া এই জমিদার শ্রেণী সেই দুই টাকা পকেটে পুরিতেছে। এই অবস্থাটিই আপনাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী। এই শ্রেণীকে সৃষ্টি করিয়াছে আমাদের বর্তমান প্রভুরা অর্থাৎ বৃটিশ গবরমেণ্ট। ইহাদের নিকট প্রশ্রয় পাইয়াই আমাদের জমিদার তালুকদারেরা লায়েক হইয়া উঠিয়াছে। সরকার আর জমিদারের এই মিতালিই কৃষকের দুর্দশার মূল। এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে বৃটিশ সরকারের কর্তৃত্ব আপনাদের অস্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্য, দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে আনিবার জন্য, লড়াই না করিলে চলিবে না। স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য আবার কতকগুলি দাবী চাই। তার অভাবে কিসের উপর নির্ভর করিয়া কৃষক লড়িবে? আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক অভিযোগ আছে—চৌকিদারী ট্যাক্স হইতে সুরু করিয়া শিক্ষাকর পর্যন্ত কত রকমের ট্যাক্স আপনাদের দিতে হয় অথচ ভাল রাস্তাঘাট, ভাল পানীয় জল, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছুই আপনাদের ভাগ্যে জোটে না। জমিদার মহাজনের জুলুমের তো কোন হিসাব-নিকাশ নাই। এ সকল দৈনন্দিন বিষয় লইয়া আপনারা লড়িতে পারেন, লড়িতে আপনাদের হইবে। আপনাদের এ জেলার উত্তরে হিন্দু মুসলমান, গারো হাজঙ্গ সকল জাতের কৃষক এক হইয়া টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছে। বর্ধমান জেলায় সরকার দামোদর খাল তৈয়ার করিয়াছেন। ইহার জলে কৃষকের জমির বিশেষ কোন উপকার হোক বা না হোক সরকার অত্যধিক হারে জলকর দাবী

করিতেছেন। কৃষকেরা এক জোট হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। সরকার আইন জারি করিয়া গরু বাছুর ক্রোক ও নিলাম করিয়া গ্রামে গ্রামে পুলিস ও ফৌজকে টহল দেওয়াইয়া এবং সত্যাগ্রহী কৃষক ও কৃষককর্মীদের গ্রেপ্তার করিয়া ও জেলে পুরিয়া এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন যার ফলে কৃষকদের দুর্দশার সীমা নাই। তথাপি সেখানকার কৃষক তাদের লড়াই চালাইতেছে। সেই জাতীয় লড়াই আপনাদেরও করিতে হইবে।

জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ

এ সকল দৈনন্দিন দাবী তো আছেই। তা ছাড়া বিশেষ করিয়া আজকার দিনে আপনাদের সব চেয়ে বড় দাবী বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ। আজ আপনাদের জানিয়া রাখা দরকার যে, ১৪৬ বৎসর পূর্বে কোম্পানীর আমলে ইংরেজ সরকার যখন প্রথম বর্তমান জমিদারী-প্রথা সৃষ্টি করে, তার আগে জমির মালিক ছিল কৃষক। ইংরাজ সরকারের ইচ্ছায় রাতারাতি বন্দোবস্ত হইয়া গেল, জমির মালিক হইল জমিদার—যদিও তাহারা পূর্বে ছিল সরকারী রাজস্ব আদায়ের জন্ত তহশীলদার মাত্র। কৃষকের জমি হইতে বেদখল যে করা হইল, সেজন্ত কি আগে হইতে তাহার কোন সম্মতি লওয়া হইয়াছিল অথবা তাহাকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দিবার কথা উঠিয়াছিল! জমিদারী-প্রথা শতকরা ৯০ জন লোককে শোষণ করিয়াছে, বহু লোককে নিরন্ন করিয়াছে, সমস্ত সমাজকে কলুষিত করিয়াছে, তার নৈতিক জীবন নষ্ট করিয়াছে। তা সত্ত্বেও আজ কথা উঠিয়াছে, জমিদারী-প্রথা তুলিয়া দিতে হইলে জমিদারকে খেসারত দিতে হইবে!

আমাদের প্রশ্ন, এই খেসারত কি জমিদারদের জুলুম, শোষণ ও সমাজকে নানা ভাবে কলুষিত করার পুরস্কার? অত্যাচারীকে উপযুক্ত শাস্তি না দিয়া ন্যায়সঙ্গত পুরস্কার দেওয়ার কথা বোধ হয়, আমাদেরি এ

সমাজে উঠিতে পারে! জমিদার রায়তের নিকট খাজনা বাবত যা আদায় করে, তার অতি সামান্য অংশ সরকারী রাজস্ব হিসাবে দিয়া বাকি সমস্তই ভোগ করে নিজে। তার উপর জলকর, বনকর ইত্যাদি এবং অনেক রকম বাজে আদায়ও আছে। এ সমস্ত আদায় আজও চলিতেছে। তথাপি জমিদারদের খেসারত বা পুরস্কার দিবার প্রস্তাব আসে কেমন করিয়া, আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

লড়াই আসন্ন

এ সমস্ত ছোট বড় দাবী আজ যদি কৃষককে আদায় করিয়া লইতে হয়, তবে আইন আদালতের সাহায্যে বা উকিলের পরামর্শে তাহা সম্ভব হইবে না। কৃষকেরা যদি জোট বাঁধে, এক হয়, সমিতি গড়িয়া তুলিয়া আন্দোলন চালায়, দেশে আরো যাহারা স্বাধীনতাকামী তাহাদের সহিত যোগ দেয় এবং স্বাধীনতা ও অন্যান্য দাবীগুলি সামনে রাখিয়া বিরুদ্ধ শক্তিগুলির সঙ্গে লড়িতে পারে, তবেই তাহাদের সমস্যার নিষ্পত্তি হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন নিজেদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কৃষকদের চেতনা লাভ। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আরো একটি জিনিষ বুঝিতে হইবে—হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, যারাই লাঙ্গল ধরে, জমিদারের ও মহাজনের জুলুম ভোগ করে, তারাই এক জাতি, তাহাদের স্বার্থ এক। জাতি বা বর্ণের ভেদাভেদ আমাদের লড়াইয়ের মধ্যে আসিতে পারে না, কারণ যে স্বার্থের জন্য আমাদের লড়াই সে স্বার্থ আমাদের সকলেরি এক। কৃষকেরা একটি শ্রেণী, জমিদারেরা আর এক শ্রেণী। কৃষকেরা পয়দা করে অথচ খাইতে পায় না; জমিদার কিছু করে না অথচ খাওয়া পরা ছাড়া অপব্যয়ও করে। আপনাদের এ জেলার এক কৃষক বন্ধু বলিয়া থাকেন, এ যুগের লড়াই চলিয়াছে ভরা-পেটের সাথে খালি-পেটের। এই কথাই আজ আমাদের কৃষকের জীবনের বড় কথা।

একটী ভূমিরাজস্ব তদন্ত কমিটি বসান হইয়াছে—কৃষকের দাবীর চাপে পড়িয়া বাংলা সরকার তাহা নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই কমিটী আপনাদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন। কৃষক যে আমাদের দেশে শোষিত, নিঃস্ব, তাহা কি আবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়? যাই হোক আপনাদের নিকটে যদি তদন্ত কমিটি আসে অবশ্য আপনারা আপনাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তাঁহাদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। আপনাদের যাঁরা বন্ধু ও প্রতিনিধি তাঁরা পূর্বেই আপনাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তদন্ত কমিটির গোচরে আনিয়াছেন।

দেশের এবং দুনিয়ার অবস্থা আজ এমন জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়াছে যে অচিরে আমাদের একটী বৃহৎ সংগ্রামে ঝাপাইয়া পড়িতে হইবে বলিয়া মনে হয়। বন্ধুগণ, আপনারা প্রস্তুত হোন। এই আপনাদের সুযোগ—বহুদিনের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দশার আপনারা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া নিন।

সমিতি আপনাদের দাঁড়াইবার জায়গা, আপনাদের লড়াইয়ের বুনিয়াদ এবং লড়াইয়ের অস্ত্র। গ্রামে গ্রামে ইহা গড়িয়া তুলুন, আপনাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। কার সাধ্য আপনাদের মিলিত শক্তিকে ঠেকাইয়া রাখে?

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

১৮ই মার্চ্চ

কিশোরগঞ্জ

ময়মনসিংহ।